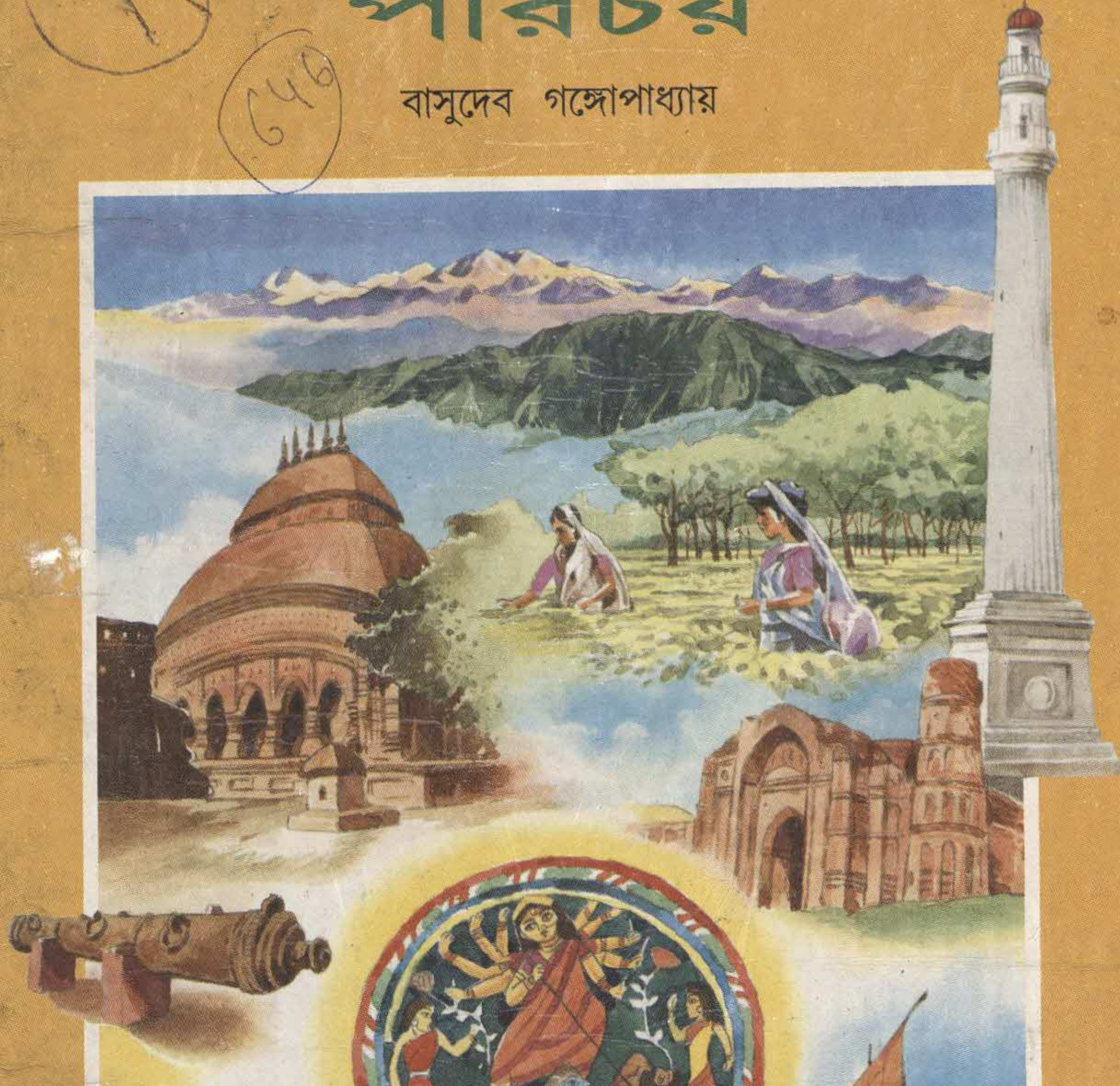
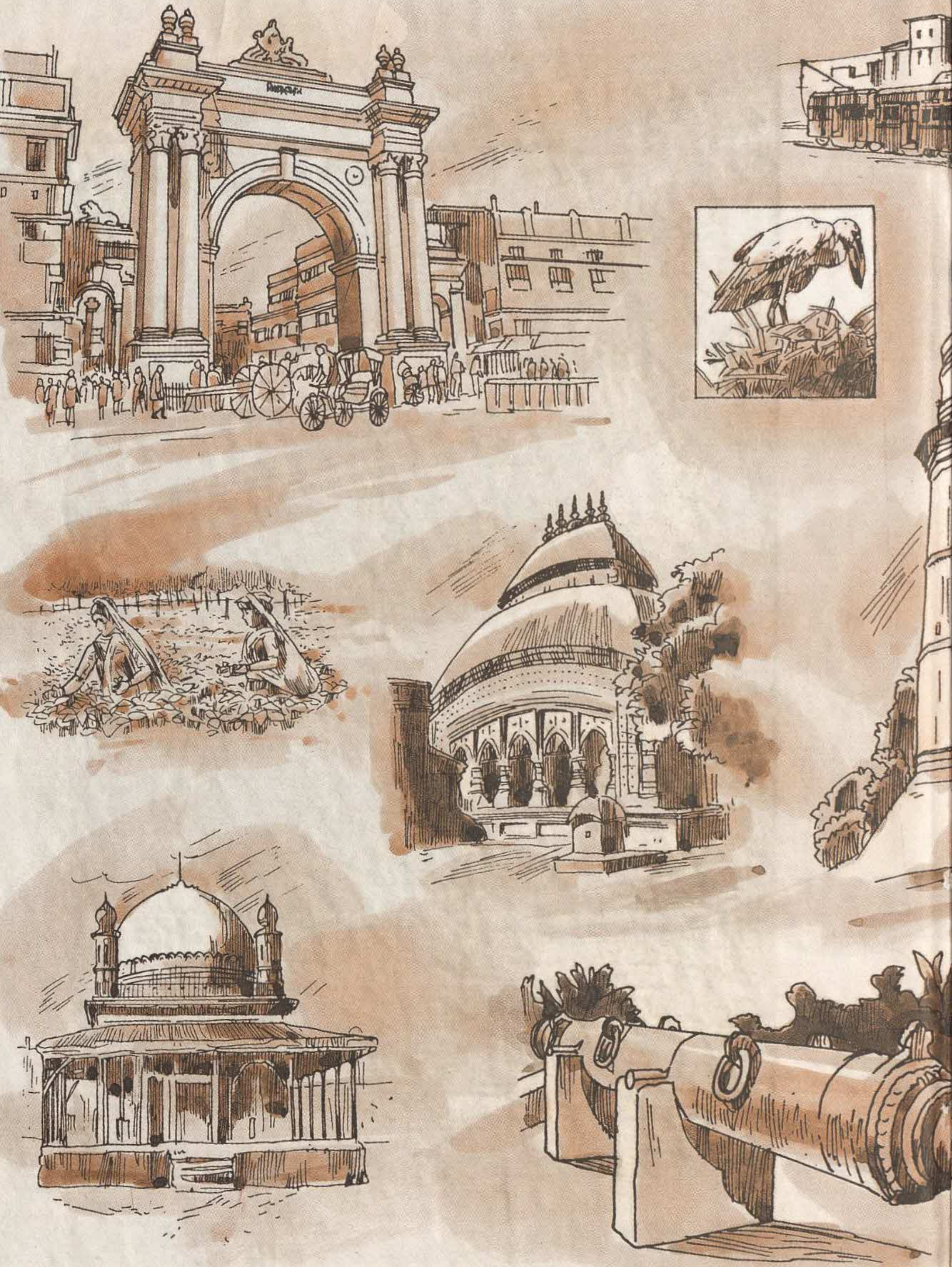
পশ্চিমবঙ্গ পরিচয়

বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়



শিশু সাহিত্য সংসদ





পশ্চিমবঙ্গ পরিচয়

লেখা : বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়
ছবি : অলয় ঘোষাল





শিশু সাহিত্য সংসদ



PASCHIMBANGA PARICHAY
(West Bengal : An Introduction)
by Basudev Gangopadhyay

ISBN 81-86806-71-7

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪

মূল্য টাকা ৬০.০০ মাত্র

উৎসর্গ

মা-কে



প্রকাশকের নিবেদন

ক্ষুদ্র হলেও অল্প নয়, ইংরেজিতে বলে precious little—এই বইটিও তাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রাসঙ্গিক অথচ অনেক জানা-অজানা তথ্যে পূর্ণ, কিন্তু তথ্য ভারাক্রান্ত নয় এবং আরও জানার নির্দেশিকাসহ প্রত্যেকটি জেলার স্বতন্ত্র কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয় এমন আলোচনায় সরসভাবে লিখিত হয়েছে বইটি। এতে অতীত প্রসঙ্গ থেকে আধুনিক রূপান্তর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার আগে একটা অধ্যায়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তার আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। একই সময়ে আনন্দদায়ক ও উপযোগী হবে এই বিশ্বাস রেখেই সব নবীন পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দেওয়া গেল।

কলকাতা
জানুয়ারি ২০০০

দেবজ্যোতি দত্ত



গ্রন্থ প্রসঙ্গে

J. M. Mogey তাঁর 'The Study of Geography' বইতে কোনো এক অখ্যাতনামা লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, ইতিহাস মানে chaps আর ভূগোল মানে maps। অর্থাৎ (ইতিহাস) বইয়ের অধ্যায়ে, আর মানচিত্রের রেখায় আবদ্ধ আছে মানুষের ইতিহাস আর তার ভৌগোলিক পরিবেশের খতিয়ান। এবং এই অধ্যায় ও মানচিত্র পাঠেই ঘটবে সেই মানব ইতিহাস ও ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়। কিন্তু এই chaps আর maps দিয়ে কি দেশ, কাল ও তাদের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে? ঘটলেও কতখানি? যতই বলা যাক 'A map is a social symbol', maps-chaps থেকে সেই সমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় কি কখনো ঘটতে পারে? Map-এর কনটুর (contour) রেখায় মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের ছবি সত্যিই কি চিত্রিত হয়?

এ প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বইটি প্রশাসনিক বিভাজন অনুসারেই আলোচিত হয়েছে। এই বিভাজন জেলার ধারণা ভিত্তিক। জেলার ধারণাটা আধুনিক। ইংরেজ আমলে তৈরি। এ ছাড়াও আছে থানা, মহকুমা এবং বিভাগ। এগুলি আজকের প্রচলিত প্রশাসনিক বিভাজন। একটি রাজ্যকে সুষ্ঠু প্রশাসনিক পরিচালনার উদ্দেশ্যে এইভাবে ভাগ করা হয়। এইরকমটি কিন্তু বরাবর ছিল না। প্রাচীনকালে এইরকম ভাগগুলির নাম ছিল ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল ইত্যাদি। ভুক্তি ছিল সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিভাগ, বিষয় ছিল আজকের জেলার মতো। বিষয়গুলি বিভক্ত ছিল কতগুলি মণ্ডলে, মণ্ডলগুলি বীথিতে, বীথিগুলি গ্রামে। হিন্দুযুগের ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল মুসলমান যুগে সরকার, মহল, পরগনা, চাকলায় বিভক্ত হয়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে এলাকা বিভাজন এবং তাদের আলাদা আলাদা নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এ থেকে এটা মনে করার কোনো যুক্তি নেই যে, বারবার এলাকার সীমানা পরিবর্তন করে ওই এলাকার ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন নির্দিষ্ট করা সম্ভব। আসলে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক কারণেই এলাকার সীমানা পরিবর্তন করে তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত করার প্রয়োজন হয়েছে। আজও হচ্ছে।

১৯৮৬ সালের আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলা ছিল, আজকে ১৮টি। ভবিষ্যতে আরও খণ্ডিত জেলার জন্ম হবে। আর সেই অনুসারে আলোচনার প্রেক্ষাপটও পালটাবে। কিন্তু ওই প্রশ্নটা কি পালটাবে?

তাই জেলা ভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। সুতরাং জেলার পরিচয় পড়তে পাঠককে জেলার গণ্ডী ভাঙতে হবে; সীমান্ত রেখা ধরে নয়, তাকে এগোতে হবে ঘটনার সূত্র ধরে ঘটনান্তরে, সময়ের সূত্র ধরে সময়ান্তরে। তবেই পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় পাঠের খানিকটা সার্থকতা লাভ হলেও হতে পারে।

এই বই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত নয়। অন্যের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করেই লেখা। এই তথ্যও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিতর্কিত। যেমন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের বছর নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে। 'নদীয়া কাহিনী'তে বছরটির উল্লেখ আছে ১২০২ বলে, ২৪-পরগনার 'গেজেটিয়ার'-এ ১২০১, রমেশচন্দ্রের 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-এ 'সম্ভবত ১২০২' এবং ওই বইয়েরই ফুটনোটে '১২০০-১২০৪', অতুল সুরের 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' বইতে ১২০৪ বলে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান বইটি এইরকম বিতর্কের উপযুক্ত স্থান নয় বিবেচনায় বিতর্কগুলি বাদ গেছে।

বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশনে আলোচনা স্থানেই যথাসম্ভব তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বইয়ের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক আলোচনায় এবং কলকাতা প্রবন্ধে এই প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি। বইয়ের বাকি অংশে পড়ার স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষায় যথাসম্ভব এটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ভিতরে উল্লিখিত লেখক বা বইয়ের নাম বইয়ের শেষে দেওয়া গ্রন্থপঞ্জীর সংস্করণে খুঁজতে হবে।

জেলার প্রবন্ধগুলি জেলানামের বর্নানুক্রমিক বিন্যাসে সাজানো হয়েছে।

কলকাতা
জানুয়ারি ২০০০

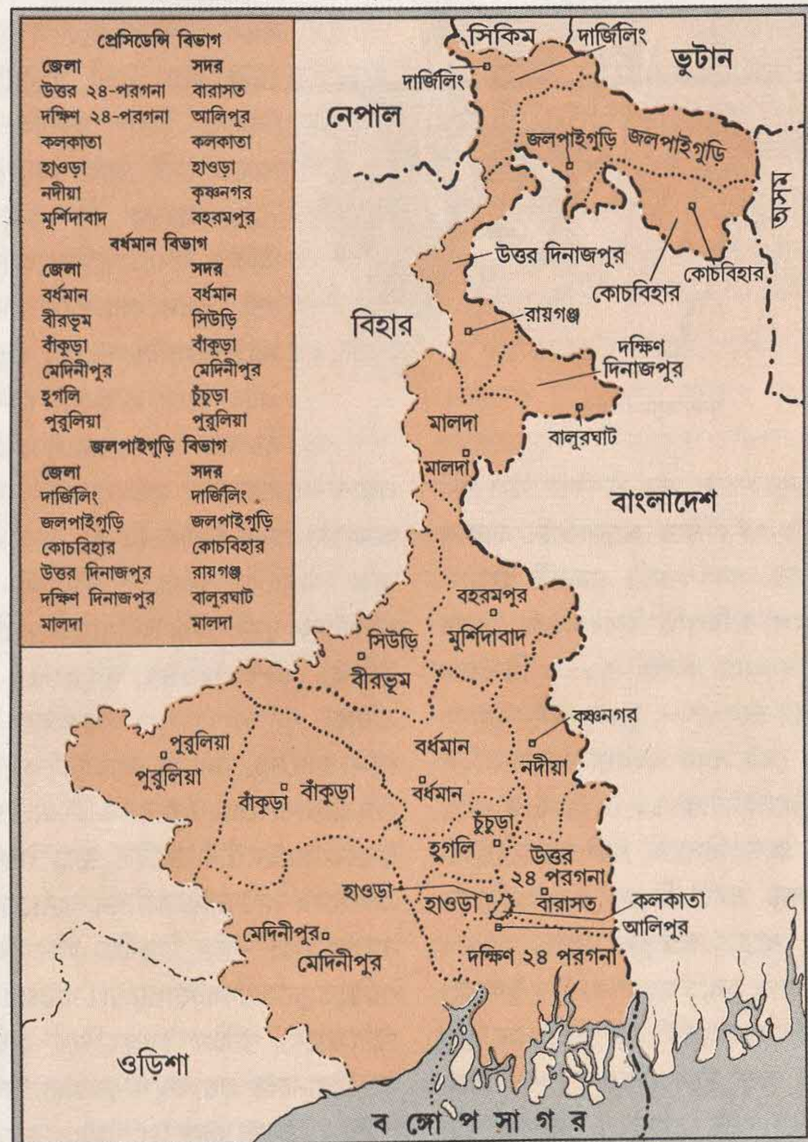
বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়



সূচি



পশ্চিমবঙ্গ পরিচয়



ভূমিকা—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমগ্র ভারতবর্ষের মোট আয়তনের প্রায় ৩ শতাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত। আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ দ্বাদশ রাজ্য। আয়তনের তুলনায় রাজ্যের উপর জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি—দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ রাজ্য—দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.০৪ শতাংশ লোক এই রাজ্যে বাস করে; জনঘনত্বের দিক থেকে ৭৬৭ জন মানুষ বাস করে এক বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ এলাকায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' অবস্থার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি ফেরাতে হবে পিছনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে।



সুন্দরবনের বাঘ

আসলে বাংলা কখনো এত শীর্ণকায় ছিল না। বাঙালি তখন হাত-পা ছড়িয়ে অনেকখানি আকাশ আর আঙিনা নিয়ে বাস করত। এমনকী ইংরেজ আমলে 'সুবে বাংলা'র বিস্তৃতি ছিল ওড়িশা, বিহার ধরে উত্তরপ্রদেশের আগ্রা পর্যন্ত। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে আগ্রা চলে গেল, ঢুকল অসম (প্রথম বর্মাযুদ্ধের পর)। সেই সময় বাংলার আয়তন ছিল ৫০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অসম বাংলার অংশ হিসাবে শাসিত হয়েছিল। ১৯৪৬-এর বাংলায় সমস্ত বিহার এবং ওড়িশার কিয়দংশ (কটক ধরে) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগ হল, বাংলা হল দু-টুকরো। অবিভক্ত বাংলার তিনভাগের এক ভাগ মাত্র এল পশ্চিমবঙ্গে, বাকি অংশ চলে গেল পূর্ব-পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ)। এই সময় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসা গৃহহারা মানুষের স্রোত এক পর্বতপ্রমাণ সমস্যা তৈরি করল। পুনর্বাসনের সমস্যা। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে এই সময় থেকে আর-এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

বঙ্গভঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জন্ম—প্রথমবার বাংলা ভাঙার চেষ্টা হয়েছিল ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের রাজত্বকালে। সে চেষ্টা তখন সফল হয়নি। দীর্ঘ ৪২ বছর পর ১৯৪৭ সালে বাংলাকে ইংরেজ আবার ভাঙতে চেষ্টা করল এবং এবার সফল হল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—শাসকদলের শাশ্বত সেই আকাঙ্ক্ষা divide and rule—প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ শাসন টিকিয়ে রাখতে শাসিতকে বিচ্ছিন্ন রাখো। তাই প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে ১৯০৪ সালে তদানীন্তন হোম সেক্রেটারি এইচ এইচ রিজলে বাংলা কেন ভাগ করা দরকার তা খোলাখুলি এক চিঠিতে প্রকাশ করেছিলেন : 'যুক্ত বাংলা একটা শক্তি . . . আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য (একে) ভাঙা এবং এইভাবে যারা আমাদের রাজত্বের বিরোধী সেই নিরেট শক্তিটাকে দুর্বল করা।' (*সুমিত সরকার : **মডার্ন ইন্ডিয়া, ১৮৮৫-১৯৪৭**, (১৯৮৫), ম্যাকমিলান, মাদ্রাজ, পৃ: ১০৭*)। ৪২ বছর ধরে সেই প্রক্রিয়া চালিয়ে সেই 'নিরেট শক্তিটা'কে দুর্বল করতে পেরেছিল ইংরেজ শাসক, তাই ১৯৪৭ সালে যখন ইংরেজ আইনজীবী সিরিল র‍্যাডক্লিফ-এর নেতৃত্বে একজনের বাউন্ডারি কমিশন বানানো হল, ১৯০৫ সালের সেই দুর্দান্ত বিপ্লবীরা আর ফিরে এল না। শান্তিতে চুকে গেল ব্যাপারটা। বাংলার পূর্বদিক গেল পাকিস্তানে, পশ্চিম অংশ নিয়ে হল পশ্চিমবঙ্গ। ডা. বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতারা 'বঙ্গ'-এর আগে 'পশ্চিম' কথাটা জুড়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' নাম রাখার পক্ষে রায় দিলেন।

বাংলা ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ—বঙ্গদেশ এক ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও দুই ভাগে দুটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে খণ্ডিত হল। এই দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ভিত্তি ছিল ধর্ম। সংখ্যাগুরু অমুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ, এবং

মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ হল পূর্বপাকিস্তান। ভাগাভাগি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা দাঁড়াল তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বৃহদায়তন অবিভক্ত বাংলার মাত্র এক তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত পশ্চিমবাংলার এলাকাগত সমস্যা দেখা দিল। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। বিহারের মধ্যে দিয়ে ছাড়া যোগাযোগের আর কোনো উপায় রইল না। গোটা দেশের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগও প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, কেবল নকশালবাড়ির ১৫ কিমি ভূমিখণ্ডের যোজকটুকু ছাড়া।

এই অবস্থার কাজ-চলা গোছের বিহিত হল ১৯৫৬ সালে রাজ্যপুনর্গঠন আইনের মাধ্যমে। বিহারের পুর্নিয়া জেলার পূর্বদিকের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকিয়ে মহানন্দা করিডর তৈরি হল। এই পথেই যুক্ত হল উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ। ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ ও তার উপর দিয়ে রাস্তা ও রেলপথ তৈরি করে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা কিছুটা মিটলেও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেশ দুর্বলই থেকে গেল, আগের মতো আর জমল না। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছিল মোটে ৭৮০০০ বর্গ কিলোমিটার। জোড়াতালি দিয়ে পরবর্তীকালে তার পরিমাণ বেড়েছে বটে কিছুটা, কিন্তু নদীমাতৃক পলিগঠিত উর্বর বাংলা বলতে যা বোঝায় তা রয়ে গেল অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশেই। অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের জোগানদার ছিল যে অঞ্চল তা এখন বাংলাদেশে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ অনেকখানি বাড়ানো হলেও পাটের গুণগত দিক থেকে তার অভাবপূরণ হল না। ফলে পাটকলগুলির উৎপাদন ব্যাহত হল। কলকাতার ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে মাছের বেশিরভাগ চাহিদা মেটাতে ওই বাংলাই ছিল একমাত্র ভরসা। এখন অন্য রাজ্যগুলি থেকে মাছ আমদানি করে সেই চাহিদা মেটানো হয়। বাংলা ভাগের ফলে বেশিরভাগ বাংলাভাষী মানুষ চলে গেল ওই পারে। এর ফলে বাংলা প্রকাশন এবং বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পজগত যে ধাক্কা খেল তা থেকে তারা এখনও সামলে উঠতে পারেনি। আসলে যুক্ত বাংলার শক্তি কোনো পেশি শক্তি নয়, একটা আর্থ-সামাজিক শক্তি। আজকের পারস্পরিক বঞ্চনায় বাঙালির সেই শক্তিই ব্যাহত হয়েছে।

এই রাজ্যের উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্বে অসম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে নেপাল, বিহার ও ওড়িশা। এই রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে লম্বায় প্রায় ৬০০ কিলোমিটার, চওড়ায় আয়ত প্রস্থ বিন্দুতে ৩০০ কিলোমিটার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে পশ্চিমবঙ্গ আয়তনের দিক থেকে প্রায় পর্তুগালের সমান, হল্যান্ড ও বেলজিয়ামকে একসঙ্গে করলেও পশ্চিমবঙ্গই বড়ো, এবং যুক্তরাজ্যের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে একটু বেশি।

এই রাজ্যের একদম উত্তরে সুউচ্চ পাহাড়। দক্ষিণে সমুদ্র। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে কোথাও একঘেয়েমি নেই। প্রকৃতির রূপ জেলা থেকে জেলান্তরে ভিন্নতর হয়েছে। কত রকমের মানুষ, কতরকম উপভাষায় তারা কথা বলে, আচার-অনুষ্ঠান, জীবিকার বিভিন্নতায় এক বাঙালি হয়েও তারা কত বিচিত্র।

প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য রাজ্যটিকে জলপাইগুড়ি, প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এদের অন্তর্গত জেলার সংখ্যা মোট আঠারোটি।

জলপাইগুড়ি বিভাগ : (১) দার্জিলিং, (২) জলপাইগুড়ি, (৩) কোচবিহার, (৪) উত্তর দিনাজপুর, (৫) দক্ষিণ দিনাজপুর, (৬) মালদা।



কাঞ্চনজঙ্ঘা

প্রেসিডেন্সি বিভাগ : (১) উত্তর ২৪-পরগনা, (২) দক্ষিণ ২৪-পরগনা, (৩) কলকাতা, (৪) হাওড়া, (৫) নদীয়া, (৬) মুর্শিদাবাদ।

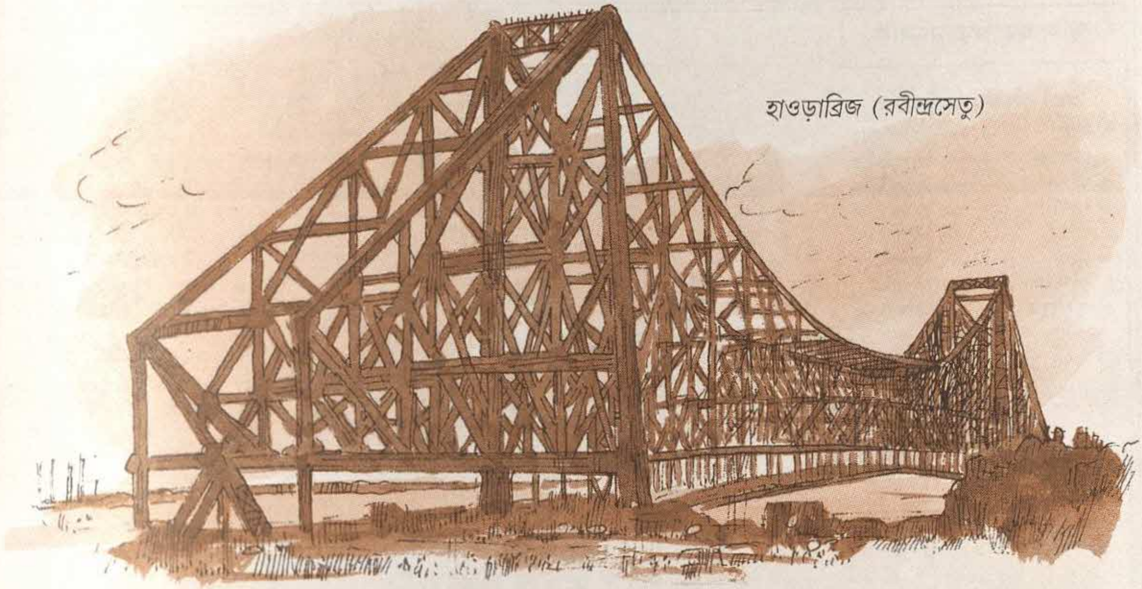
বর্ধমান বিভাগ : (১) বর্ধমান, (২) বীরভূম, (৩) বাঁকুড়া, (৪) মেদিনীপুর, (৫) হুগলি, (৬) পুরুলিয়া।

প্রকৃতি পরিচয়—পশ্চিমবঙ্গ প্রধানত একটি বদ্বীপ। গঙ্গাবিধৌত উর্বর পলিমাটি বহু লক্ষ বছর ধরে জমে জমে এই বদ্বীপ গড়ে উঠেছে। এটি একটি বিরাট, বিস্তৃত সমতল ভূমিখণ্ড। এর পরিমাণ রাজ্যের মোট এলাকার ৯৩ শতাংশ। রাজ্যের উত্তরভাগ পর্বতময়, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়ের অংশবিশেষ দ্বারা গঠিত। এই পর্বতময় অংশ রাজ্যের মোট ভূমিখণ্ডের মাত্র ১ শতাংশ। বাকি ৬ শতাংশ এলাকা রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত ধরে বিস্তৃত নাতিউচ্চ মালভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলে মাটি লাল, এখানে-সেখানে ছোটোখাটো গড়ানে পাহাড় আর শাল, মহুয়া, পলাশের জঙ্গল।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের উত্তরভাগের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমিখণ্ড থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো এই অংশ হিমালয়ের পাদদেশ থেকে খুব দূরে নয়। ভূমিধস, প্রচুর বৃষ্টিপাত আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। অনেকগুলি খরস্রোতা নদী এই অঞ্চল থেকে বেরিয়েছে। ঘন সবুজ বনময় তরাই এবং ডুয়ার্স এই অঞ্চলেই।

পশ্চিমে মালভূমির 'ঝালর' বা 'প্রান্ত' অঞ্চল। এটি বিহারের ছোটোনাগপুর মালভূমির অংশ। ছোটোনাগপুরের মালভূমি আবার দাক্ষিণাত্যের লাভা-গঠিত মালভূমি বা 'ডেকান ট্র্যাপ'-এর ধারাবাহিক অংশ যা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে বিস্তৃত হয়ে ওই মালভূমিখণ্ডের প্রান্তসীমা নির্দেশ করছে। ঠিক যেন ঝালর দেওয়া বস্ত্রখণ্ডের প্রান্তভাগের মতো। মালভূমি যখন প্রকৃতির নিরন্তর ক্ষয়কারী শক্তির আঘাতে তার নিজস্ব উচ্চতা হারিয়ে, নদীনালার স্রোতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তাকে বলে 'ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি'। ছোটোনাগপুরের মালভূমি তার দৃষ্টান্ত।

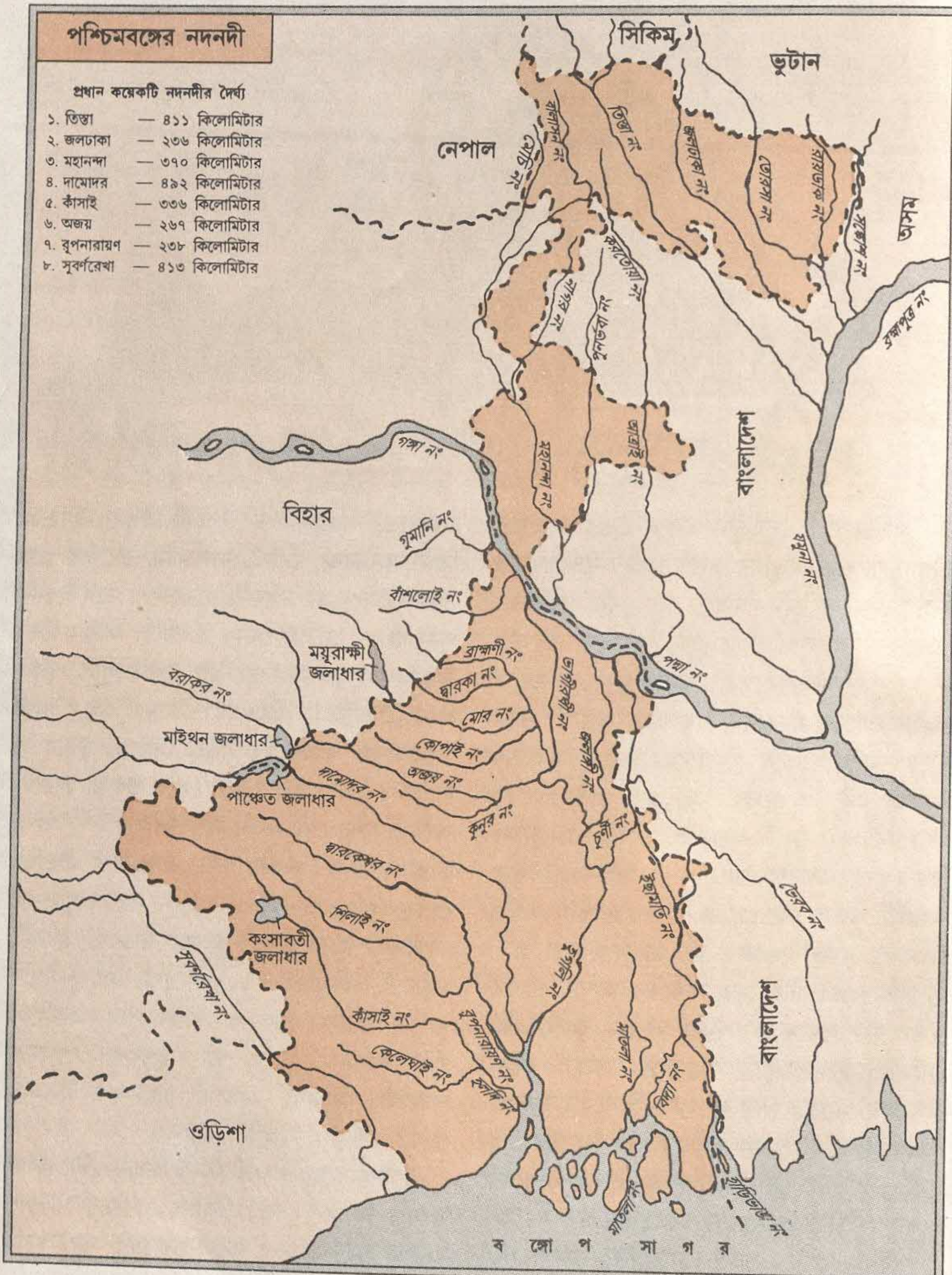
পশ্চিমবঙ্গের এই মালভূমি অঞ্চলে পুরুলিয়া জেলা অধিকতর উচ্চ এবং এখানেই রয়েছে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ অযোধ্যা পাহাড়। এর দু-পাশে সুবর্ণরেখা আর কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর খাত। স্থানভেদে এর উচ্চতা ২০০ থেকে ৩০০ মিটার। এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গোরগাবুরু ৬৭৭ মিটার উঁচু। পাঞ্চেত পুরুলিয়ার একমাত্র জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়। এই পাহাড়ের শীর্ষ সমতল, এর উচ্চতা ৬৪৩ মিটার। পুরুলিয়ার এই উচ্চভূমি ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু হয়েছে; পূর্ব দিকে এই উচ্চভূমি ঢালু হতে হতে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে, দক্ষিণ-পূর্ব ঘেঁষে মেদিনীপুরে কিছুটা। বাঁকুড়ায় এই উচ্চভূমির শেষ টুকরো শুশুনিয়া পাহাড়, যার উচ্চতা ৪৪০ মিটার। প্রধানত ল্যাটেরাইট ও লাল মৃত্তিকা ধরনের মাটি দ্বারা গঠিত এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।



পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল উত্তর ভারতের বিশাল গাঙ্গেয় সমভূমির অংশ। সেই অনুসারে একে নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল বলা যায়। দার্জিলিং জেলার দক্ষিণভাগ, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গের সমভূমির অংশে ডুয়ার্স (ভুটান রাজ্যে প্রবেশের দ্বার অর্থে ডুয়ার্স) নামে খ্যাত। এটি আসলে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অংশ। এই অঞ্চলের আয়তন ৬৬০০ বর্গ কিলোমিটার। কোশি-মহানন্দা কোরিডর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদার সমভূমি ও মহানন্দা-তিস্তার অন্তর্বর্তী ভূভাগ নিয়ে গঠিত বারিন্দ সমভূমি। বদ্বীপ অঞ্চলের সমভূমির মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া মৃত বদ্বীপের অংশ, পরিণত বদ্বীপ অঞ্চলের মধ্যে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি এবং মেদিনীপুরের সমভূমি অন্তর্ভুক্ত। সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত এলাকা হল দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চল। বীরভূম ও বাঁকুড়ার প্রায় সমগ্র অংশ এবং মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত রাঢ় সমভূমি।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদীগুলিই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী ও উপনদী হিসাবে চিহ্নিত। তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক এবং সঙ্কোশ ব্রহ্মপুত্রের উপনদী; মহানন্দা ও তার উপনদী পুনর্ভবা ও আত্রাই গঙ্গার উপনদী। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ থেকে বেরিয়ে এই উপনদীগুলি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। তোর্সা (তিব্বতে জন্ম) ছাড়া উত্তরবঙ্গের বাকি সব নদীই সিকিম, ভুটান ও দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। রাজ্যের মধ্যাংশের প্রধান নদীগুলি হল গঙ্গা ও তার শাখানদী জলঙ্গী, চূর্ণী, মাথাভাঙা প্রভৃতি। রাজ্যের পশ্চিমাংশে প্রবাহিত প্রধান নদ-নদীগুলি হল দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয়, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা। এই নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বে বা দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্যাধরী, পিয়ালি, মাতলা, রায়মঙ্গল, ইছামতি প্রভৃতি নদীগুলি উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য তিনটি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত : (১) হিমালয় পর্বতের পাদদেশ সংলগ্ন পার্বত্যভূমি ও তরাই-ডুয়ার্সের সমতলভূমি


পশ্চিমবঙ্গের নদনদী
প্রধান কয়েকটি নদনদীর দৈর্ঘ্য
১. তিস্তা — ৪১১ কিলোমিটার
২. জলঢাকা — ২৩৬ কিলোমিটার
৩. মহানন্দা — ৩৭০ কিলোমিটার
৪. দামোদর — ৪৯২ কিলোমিটার
৫. কাঁসাই — ৩৩৬ কিলোমিটার
৬. অজয় — ২৬৭ কিলোমিটার
৭. রূপনারায়ণ — ২৩৮ কিলোমিটার
৮. সুবর্ণরেখা — ৪১৩ কিলোমিটার
সিকিম
ভুটান
নেপাল
আসাম
বিহার
বাংলাদেশ
ওড়িশা
তিস্তা নং
জলঢাকা নং
তোর্ষা নং
ব্রহ্মপুত্র নং
গঙ্গা নং
গুমানি নং
বাঁশলোই নং
ময়ূরাক্ষী জলাধার
ব্রাহ্মণী নং
দ্বারকা নং
বরাকর নং
মোর নং
কোপাই নং
মাইথন জলাধার
অজয় নং
দামোদর নং
পাঞ্চেত জলাধার
কুনুর নং
দ্বারকেশ্বর নং
শিলাই নং
কংসাবতী জলাধার
সুবর্ণরেখা নং
কাঁসাই নং
কেলেঘাই নং
রূপনারায়ণ নং
পদ্মা নং
ভাগীরথী নং
জলঙ্গী নং
চূর্ণী নং
ইছামতী নং
মাতলা নং
বিদ্যা নং
বঙ্গোপসাগর

অঞ্চলের বন, (২) রাজ্যের পশ্চিমে (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূম জেলাধীন এলাকা) মালভূমি অঞ্চলের বন এবং (৩) দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা ও উত্তর ২৪-পরগনার কিছু অংশ জুড়ে ব্যাপ্ত সুন্দরবনের লবনাম্বু বনাঞ্চল। উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে অরণ্য আবার সাত রকম : (১) আলপাইন বনাঞ্চল। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে ৩০০০ মিটার বা তারও বেশি উচ্চতায় এই বনাঞ্চল দেখা যায়। রডোডেনড্রন, পাইন (কনিফার) প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছ আছে এই বনে। (২) পূর্বহিমালয়ের আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ বনাঞ্চল, যা দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে ১৮০০ থেকে ৩০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থান করছে। ওক, ছোটো জাতের বাঁশ প্রভৃতি গাছ এই বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। (৩) উপক্রান্তীয় পার্বত্য বনাঞ্চল দেখা যায় ১৮০০ থেকে ২০০০ মিটার উচ্চতায়। এই বনাঞ্চলের গাছের মধ্যে ওয়ালনাট, বার্চ, চেস্টনাট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। (৪) ক্রান্তীয় প্রায় চিরহরিৎ পর্ণমোচী অরণ্য। মূলত ডুয়ার্স অঞ্চলে (জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার অন্তর্বর্তী) চাঁপ, পিটালি, বহেড়া প্রভৃতি যে উন্নতমানের কাঠ উৎপাদনকারী গাছ জন্মায় তাদের নিয়েই এই অরণ্য গঠিত। (৫) ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য। এই অরণ্যের প্রধান বাসিন্দা শাল এবং তার সঙ্গে চাঁপ, খয়ের, শিশু প্রভৃতি গাছ আছে। এদের জলপাইগুড়ি-কোচবিহার জেলার তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে দেখা যায়। (৬) ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য। এই অরণ্যে আছে শাল, পলাশ, মহুল, অর্জুন, কেন্দ প্রভৃতি গাছ যারা মূলত পশ্চিমবাংলার মালভূমি অঞ্চলে (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায়) জন্মায়। (৭) সুন্দরবনের কর্দমাক্ত ও সিক্ত বনাঞ্চল।

উত্তরবঙ্গের বনজ সম্পদের মধ্যে উন্নত মানের শালের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। দামি আসবাবপত্র তৈরি করতে এখানকার সেগুন, চাঁপ, পানিসাজ ইত্যাদি গাছের কাঠ প্রয়োজনে লাগে। ড্রইংবোর্ড, দেশলাই কাঠি ইত্যাদির জন্য হালকা ও নরম কাঠ পাওয়া যায় সিলভার ফার, পাইন ইত্যাদি গাছ থেকে। মালভূমি অঞ্চলের শাল তেমন উন্নত মানের নয়। বিড়িশিল্পের জন্য কেন্দুপাতা, থালা তৈরির জন্য শালপাতা পাওয়া যায় এই অরণ্য থেকে। এখানে অনেকরকম ভেষজ গাছ জন্মায়। সুন্দরবনের জঙ্গলে মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত মধু সংগ্রহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল থেকে সংগৃহীত মোট কাঠের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জ্বালানি কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

গোরুমারা ও জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে এক শিংওয়ালা গন্ডার, নেওড়া নদীর উপত্যকায় বিরল প্রজাতির রেডপান্ডা এবং জোরপোখরির সালামান্ডার উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য প্রাণী। হায়না, নেকড়ে, শেয়াল, বনবেড়াল, ময়াল সাপ জাতীয় কিছু প্রাণী ছাড়া মালভূমি অঞ্চলের অরণ্যে বড়ো জন্তুজানোয়ার দেখা যায় না। সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বা বাদাবন (বা লবনাম্বু অরণ্য) হিসাবে পৃথিবীতে অনন্য। এই অনন্যতার কারণ বাদাবন হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরবন বাঘের আস্তানা হতে পেরেছে। এই বাঘও বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা পৃথিবীতে অনন্য। শেষ বাঘসুমারিতে (১৯৯৭-৯৮) এই বনে বাঘ ও বাঘিনির সংখ্যা ছিল ২৬৩। সারাদেশে ব্যাঘ্রপ্রকল্পগুলির মধ্যে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ (২৪-পরগনা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

বাংলা ও বাঙালি—শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সমগ্র বাংলাই (অধুনা বাংলাদেশ সহ) বাঙালির আবাসভূমি। বাঙালি জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি আজ মুসলমান হলেও এবং তারা আলাদা একটি রাষ্ট্র (বাংলাদেশ) গঠন করলেও বাঙালি হিসাবে তারা একই। কারণ বাঙালি বলতে নৃতাত্ত্বিক অতুল সুর তাদেরই বুঝিয়েছেন যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক। আবার

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে 'বাঙ্গালী জাতি বলিলে, যে জনসমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জনসমষ্টিকে বুঝি।'

কিন্তু এ হল আজকের চেনা বাঙালির কথা। এই বাঙালি এল কোথা থেকে, কেমনভাবে সৃষ্টি হল বাঙালি জাতির? এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু খুব সহজ নয়। এই প্রশ্নে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এ সত্ত্বেও বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ছবি পণ্ডিতরা হাজির করেছেন।



বাংলার পাখি দোয়েল

বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক্-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্ববিদরা এদের আদি-অস্ত্রাল বলে বর্ণনা করেছেন। এদের আদিঅস্ত্রাল বলার কারণ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের দৈহিক গঠনের মিল ছাড়া রক্তের মিলও আছে। উভয়ের রক্তেই 'এ' এগ্লুটিনোজেনের শতকরা হার খুব বেশি। আজকের সাঁওতাল, লোধা, শবর, ভূমিজ, মহালি, মুন্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীভূক্ত লোকরাই বাংলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর। এদের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা বেঁটে, এদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রং কালো, মাথার চুল ঢেউখেলানো। বাংলার তথাকথিত 'অন্ত্যজ' শ্রেণির লোকরাও এই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। ভাষার দিক থেকে এরা হল অস্ট্রিকভাষী। এদের পর বাংলায় এসেছিল দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকরা। এরা ভূমধ্যসাগরের উপকুল অঞ্চল থেকে এসেছিল। (*বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃ: ৪২*) এদের শরীরের গঠন মধ্যমাকার, মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোটো ও রং ময়লা। এরপর আসে আর্যভাষাভাষী লোকেরা। এদের মধ্যে প্রথমে আসে হ্রস্ব কপাল যুক্ত আলপীয় ও পরে দীর্ঘ কপালযুক্ত নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোক। প্রথম শ্রেণির লোকরা এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে পৌঁছোয় পৃথক পৃথক সময়ে। নর্ডিক গোষ্ঠীর লোকরা ছিল উত্তর এশিয়ার তৃণভূমির অধিবাসী। খ্রিস্টপূর্ব দু-হাজার থেকে এক হাজার সালের অন্তর্বর্তী কোনো একসময় এরা প্রথম এসে

বাংলার জাতীয় পশু হরিণ



পৌঁছোয় পঞ্চনদের উপত্যকায়। এদের দেহ গঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকার, মাথা বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। ভারতীয় জনসমাজে নর্ডিক উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তারপর থেকে বাংলা পর্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমাজে আলপীয় উপাদানই বেশি। আলপীয়দের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক উপাদানগুলি হল হ্রস্ব কপাল, মধ্যমাকৃতি, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল ও গায়ের রং ফরসা। নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোকরাই ঋগ্বেদ রচনা করেছিল।

নরতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালি প্রধানত এই অস্ট্রিকভাষী, দ্রাবিড়ভাষী ও আর্যভাষাভাষী লোকেদের দেহবৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত।

বাংলা ভাষার মধ্যেও এই ভাষাগোষ্ঠীগুলির প্রভাব দেখা যায়। বাংলায় আর্যভাষা আসার আগে এ দেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কিছুটা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত। উত্তর ভারতে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে অস্ট্রিকরাই প্রথম বসবাস শুরু করে। সেখানে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার পিছনে এদের অবদান রয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'গঙ্গা' শব্দটি অস্ট্রিক ভাষাগত বলে অনুমান করেছেন। 'লাঙ্গল', কর্পাস (কার্পাস) শব্দগুলি মূলত অস্ট্রিক। এ থেকে বোঝা যায় অস্ট্রিকভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা উন্নত কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল।

অন্যদিকে দ্রাবিড়ভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষে নগর সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। আর্যভাষায় 'উর', 'পুর', 'কুট' প্রভৃতি নগরজ্ঞাপক শব্দগুলি দ্রাবিড় ভাষা থেকে উদ্ভুত। বাংলা কামার (সংস্কৃতে কর্মকার) দ্রাবিড় ভাষার 'কর্মার' শব্দ থেকে নেওয়া। চারুশিল্পে ব্যবহৃত 'রূপ' ও 'কলা'ও দ্রাবিড় শব্দ। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষা আর্যভাষার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে এখন থেকে হাজার খানেক বছর আগে বাংলা ভাষা নিজস্ব রূপ পেতে আরম্ভ করে। বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই এবং তা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে গুপ্তযুগে। এইসময় ব্রাহ্মণদের জমি দান করে তাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা এবং মন্দির নির্মাণ করা হয়। এই ব্রাহ্মণরা বেদের বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এঁরা প্রথমে যে গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন সেই গ্রামকে বলা হত 'গাঁই'। এই 'গাঁই' (যেমন ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি) অনুসারে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের উপাধী নির্ণীত হয়। সমসাময়িক তাম্রপট্টসমূহ থেকে আমরা এই তথ্য জানতে পারি। এই তাম্রলিপিগুলি থেকে আরও জানা যায় যে, ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের উপাধি ছিল দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মন, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুন্ডু, নাগ, পালিত ইত্যাদি। আজ এগুলি কায়স্থ বা অন্যান্য জাতিসমূহের পদবি বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও বাংলায় কোনোদিনই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি ছিল না। বস্তুত নবম ও দশম শতাব্দী থেকেই কায়স্থরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছিল। পালযুগেও বর্তমান বাংলার জাতিবিন্যাস অনুপস্থিত ছিল। সেনযুগে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ফিরে আসে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'গাঁই'-এর প্রাধান্য এই যুগেই পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া কুলপঞ্জিকা সমূহে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে গৌড়ের রাজা আদিশূর (বল্লালসেনের মাতামহ) কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনেন। এরাই সম্ভবত পাঁচটি বারেন্দ্র—গাঁই, লাহিড়ি, বাগচি, মৈত্র ও ভাদুড়ি যারা কুলীন বলে বল্লাল সেন কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

বাঙালি নৃতত্ত্ব যাদের রক্তের মিশ্রণে পুষ্ট হয়েছে তাদেরই অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে তার অতীত সভ্যতা ও কৃষ্টির ভিত। অস্ট্রিকরা দিয়েছিল কৃষি, দ্রাবিড়রা দিয়েছিল নগরসভ্যতা, এদের হাতেই, শুরু হয়েছিল বাংলার তাম্রাশ্ম যুগের। এই উন্নত সভ্যতার প্রারম্ভ

কাল খ্রিস্টপূর্ব দু-হাজার বছর আগের কোনো সময়। পাণ্ডুরাজার ঢিবি (বোলপুর শান্তিনিকেতনের কাছে বর্ধমানের আউসগ্রাম থানায় অবস্থিত) আজও সেই সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। তামার ব্যবহারই ছিল এই সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ক্রিটদ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে এইসময় বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে তামা পাঠানো হত ওইসব দেশে। বাংলা ছিল সে-যুগের তামার প্রধান আড়ত। তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম তামার খনি ছিল ধলভূমে। বাঙালির এই সভ্যতাই ক্রমে পশ্চিমমুখী হয়ে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো, মিশর, এমনকী সুদূর মায়া-ইনকা সভ্যতাকেও প্রভাবিত করেছিল।

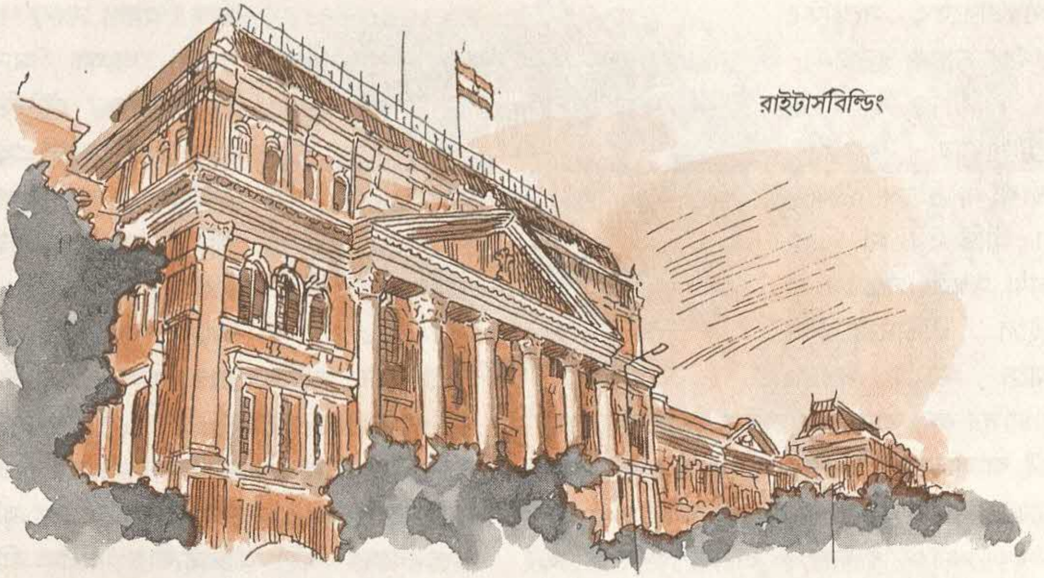
একসময় বাঙালি বিশ্বের দরবারে পরিচিত ছিল গঙ্গারিডি নামে। গ্রিক রাজদূত (খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দে পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে প্রেরিত) মেগস্থিনিসের লেখা 'ইন্ডিকা' (*Indika*) গ্রন্থে সর্বপ্রথম এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং সর্বশেষ উল্লেখ আছে খ্রিস্টীয় ২য় শতকে টলেমির 'ট্রিটিজ অন জিওগ্রাফি' গ্রন্থে। এরা শৌর্য-বীর্যে এক পরাক্রান্ত জাতি বলে বর্ণিত হয়েছে এঁদের লেখায়। বিশাল হস্তীবাহিনী ছিল তখন বাংলার প্রধান শক্তির উৎস। (*বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য*)। কাকদ্বীপে নরোত্তম হালদার তাঁর গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রের সংগ্রহশালায় গঙ্গারিডিদের সুমহান ঐতিহ্যের সাক্ষ্য হিসাবে অনেক প্রত্নদ্রব্য সংরক্ষণ করেছেন। এগুলি সংগৃহীত হয়েছে দক্ষিণ ২৪-পরগনার দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি এবং উত্তর ২৪-পরগনার চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি জায়গা থেকে।

আলেকজান্ডারের আবির্ভাবের কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা স্বাধীনতা হারায়। প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৩২২-২৯৮ খ্রি.পূ.) উত্তরবঙ্গের কিছু অঞ্চল (পুণ্ড্রবর্ধন) অধিকার করেন। অনুমান করা হয় বাংলায় এইসময় আর্যসংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর বাংলার উল্লেখযোগ্য স্বাধীন রাজা হিসাবে শশাঙ্কের (৬০৬-৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) আবির্ভাব ঘটে। শশাঙ্কের আমলে সার্বভৌম বাংলার বিস্তৃতি ছিল পশ্চিমে কান্যকুব্জ থেকে দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় অনেকদিন অরাজকতা ছিল। এই অরাজকতার সমাপ্তি ঘটিয়ে গোপাল (৭৫০-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপালের (৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দ) আমলে বাংলার সাম্রাজ্যসীমা সুদূর গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এরপর আসে সেনবংশ। বিজয় সেন (১০৯৪-১১৬০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে এই বংশের শুরু।

লক্ষ্মণসেনের আমলে (১১৭৯-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) বখতিয়ার খলজি নদীয়া দখল করে। তখন থেকে হুমায়ুনের আমলের (১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) আগে পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন সুলতানদের শাসনাধীনে থাকে। হুমায়ুনের সময় থেকে পলাশির যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলা থাকে পাঠানদের হাতে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর বাংলা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

প্রাচীন বাংলা কয়েকটি অংশে বিভক্ত ছিল। তাদের ছিল বিভিন্ন নাম। উত্তরবঙ্গে ছিল পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল। এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। পুণ্ড্রজাতির বাসভূমি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। বরেন্দ্র—গঙ্গা-করতোয়া মধ্যবর্তী অঞ্চল। *ঐতিরেয় ব্রাহ্মণে* বঙ্গের অধিবাসীদের 'বয়াংসি' বা পক্ষীজাতীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পুণ্ড্রদের 'দস্যু'। অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে বাংলার অধিবাসীদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাব লক্ষ করা যায়।

আধুনিক বাংলা নামটির উৎপত্তি হল কোথা



রাইটার্সবিল্ডিং

থেকে? আগেই দেখেছি প্রাচীন বঙ্গ নামটি বর্তমান বাংলার একটা অংশকে মাত্র বোঝাত। ১১শো শতাব্দীতে প্রাপ্ত তাঞ্জোর (তামিলনাড়ু) শিলালিপিতে 'বঙ্গলম' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এই শব্দটি আরবি ও ফারসিতে 'বাঙ্গালা' হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘলসম্রাট আকবর বাংলা অধিকার করলে আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশের নাম 'বঙ্গাল' হয়। কালক্রমে 'বাঙ্গালা' 'বঙ্গাল' শব্দগুলিই আজকের 'বাংলা'য় পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন বঙ্গ নামটি, সাঁওতাল দেবতা 'বঙ্গা' থেকে উৎপত্তি।

বাঙালির জৈবিক (নৃতাত্ত্বিক) শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়ে আজ নিঃসন্দেহে কারো মনে কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। বর্ণকৌলিণ্যের সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। বাঙালি সংস্কৃতি নিয়েও একই কথা বলা যায়। অর্থাৎ এককথায় এটি মিশ্র সংস্কৃতি। বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রাক্‌আর্য প্রভাব আজও সুস্পষ্ট। গোড়ালি খোলা জুতোর ব্যবহার, শাড়ি, ধুতি, রান্নায় তেলের ব্যবহার, ৬৪ ব্যঞ্জন, মরণোত্তর জীবনে বিশ্বাস, পূর্বপুরুষদের পূজা, ব্রত বা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে চাল, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, পান, নারকেল, সিঁদুর, কলাগাছ প্রভৃতির ব্যবহার অনার্য সংস্কৃতির অঙ্গ। শিব-শক্তির আরাধনাও প্রাক্‌আর্য যুগের অবদান। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি দেওয়া, আলপনা চিত্রণ আর্যপূর্ব সংস্কৃতি সূত্রে পাওয়া। সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে পূজা হলেও পূজায় অসংস্কৃত তামার কোসা-কুসির ব্যবহার লক্ষণীয়। ভাগবত ধর্মের উপাস্য হলেন বিষ্ণু। ঋগ্বেদে এঁর উল্লেখ আছে। কিন্তু অনার্যের আদিম টোটেম সংস্কৃতির মেলবন্ধনে মৎস্য, কুর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারের রূপ পরিগ্রহ করতে হয়েছে আর্যদেবতা বিষ্ণুকে। বাংলায় প্রাক্‌আর্য সংস্কৃতির আধিপত্য প্রাক্‌আর্য দেবতা শিবকে দিয়েও বোঝা যায়। এত শিবমন্দির বাংলায় ছাড়া আর কোথাও নেই। ব্রহ্মাও অনার্য দেবতা। এসব সত্ত্বেও এই মিশ্র সংস্কৃতি নিয়ে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বাংলা স্বতন্ত্র। বৈদিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল বিদেহ বা মিথিলা পর্যন্ত অর্থাৎ আর্যাবর্ত বা আর্যসংস্কৃতির লীলাভূমির সীমানা ছিল বিদেহ। তাই বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে

উত্তরভারতের সংস্কৃতির পার্থক্য আজও বর্তমান।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে জাতীয়তাবোধও আসে না।' সুতরাং বাঙালির জন্য তার বাংলাভাষার গুরুত্ব অনেকখানি। এই বাংলাভাষার উৎপত্তি মাত্র হাজার বছর আগে হয়েছে। প্রথম যুগের ভাষার স্থিতিকাল ৪০০ বছর (৯৫০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)। 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়' এই সময়কার ভাষায় রচিত। বাংলাভাষার ভিত রচিত হয়েছে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মাগধি-প্রাকৃত ভাষার উপর নির্ভর করে। এই ভাষাগুলির শব্দকে বলে 'দেশজ' শব্দ। এদের পরেই বাংলা ভাষা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সংস্কৃত ভাষা। বাংলা ভাষায় এ ছাড়া অনেক বিদেশি শব্দ আছে। মৌর্যযুগে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপি থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বর্ণমালার উৎপত্তি। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাদেশিক স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা লিপির জন্ম সেন আমলে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে। যদিও যে ভাষায় আজ বাংলা সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা কলকাতার ভাষা; এর জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে।



পাতালরেল

আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ— এই প্রবন্ধের ভূমিকাতে বলা হয়েছে এই রাজ্যে জনসংখ্যার চাপ দেশের মধ্যে সর্বাধিক এবং এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এমনকী ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি আটকায়নি। ১৯২১-১৯৯১ এই দীর্ঘ সত্তর বছর সময়ের মধ্যে ১৯৫১-৬১-র দশকে এই বৃদ্ধির হার (৩২.৮ শতাংশ) ছিল সবচেয়ে বেশি। এর জন্য দায়ী ছিল অবশ্যই উদ্বাস্তু স্রোত। সঙ্গে অবশ্য অন্য প্রদেশ থেকে আগত মানুষের ভিড়ও ছিল। এই ভিড়ের আনুসঙ্গিক কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যে শিল্পায়ণের আকর্ষণ। গত দশকে (১৯৮১-১৯৯১) কেরালা, তামিলনাড়ু, ওড়িশা, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, গুজরাট, বিহার, অসম ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে ছিল (২৪.৫৫ শতাংশ)। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গের এই অগ্রবর্তীতার কারণ হিসাবে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ থেকে আসা জনস্রোতকে দায়ী করা হচ্ছে। (*পশ্চিমবঙ্গবাসী : সচ্চিদানন্দ দত্ত রায়, পৃঃ ২৩*)।

শুধু জনসংখ্যাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ জন্মাবধি অনেক সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি-শিল্প বিকাশে অনগ্রসরতা, আঞ্চলিক বৈষম্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যদিও ১৯৬০ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শিল্পে অগ্রসর রাজ্য হিসাবেই বিবেচিত হত। তারপর থেকে শিল্পের অগ্রগতিতে ভাটা পড়তে আরম্ভ করেছে। কয়লা, পাট, চা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেই পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগণ্য ছিল। ব্রিটিশ পুঁজির নিষ্ক্রমণ এবং ষাটের দশকের অর্থনৈতিক মন্দাকে রাজ্যের শিল্পের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে দায়ী করেছেন কেউ [*State Industrial Profile পৃঃ* ১] কেউ তুলেছেন আর্থ-সামাজিক গভীর প্রশ্ন। রস মল্লিক (Ross Mallick পৃঃ ২৭) বলেছেন শিল্প বাণিজ্যে বাঙালির অনীহার কথা। সেই অনীহার সুযোগ নিয়েছে মারোয়াড়ি, অন্য অবাঙালি এবং বিদেশি ব্যবসায়ীরা। এরা যখন রাজ্যে বিনিয়োগ বন্ধ করে দিল তখনই

শিল্পোৎপাদনে অবনতি ঘটল। ১৯৬৫-১৯৭৫-এর মধ্যে এই অবনতি ছিল ১৬.৩ শতাংশ। অথচ সর্বভারতীয় স্তরে উলটো ছবি। সেখানে বৃদ্ধি ঘটল ৪০.৫৫ শতাংশ। আর একই সময়ে রাজ্যে কারখানা শ্রমিকের নিয়োগ কমে গেল ৪.৬৫ শতাংশ, যখন সর্বভারতীয় স্তরে ওই নিয়োগ বৃদ্ধি হল ৬.১৪ শতাংশ। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ রাজ্যের হাতে বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা শূন্য। ১৯৫১ সালের Industries (Development and Regulation) Act অনুসারে বড়ো ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের জন্য লাইসেন্স দানের ক্ষমতা সম্পূর্ণ কেন্দ্রের হাতে। ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যদিও রাজ্যের হাতেই রয়েছে।

রাজ্যের মোট বড়ো ও মাঝারি কারখানাগুলির ৮১ শতাংশ রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও ২৪-পরগনা জেলায়। এটা আঞ্চলিক বৈষম্যের নজির হিসাবে ধরা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ আজ কৃষিপ্রধান রাজ্য। রাজ্যের মোট আয়ের ৩০ শতাংশ আসে এই কৃষি থেকে। খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান প্রধান, তারপরে গম। গুরুত্বের ক্রমানুসারে অন্য কৃষিফসলগুলি হল ডাল, পাট, তৈলবীজ, আলু, চা ও তামাক। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সর্বাধিক মাছ উৎপাদনকারী রাজ্য, সারা দেশের মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশের বেশি মাছ পাওয়া যায় এই রাজ্য থেকে। তবুও তার নিজের মাছের অভাব পূরণ হয় না, জোগান ও চাহিদার ফারাক থাকে ২৪ শতাংশ।

স্বাধীনতার পর থেকে এ রাজ্যে উন্নতি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, তবুও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথাই ধরা যাক। সাঁওতালডি, কোলাঘাট, ব্যান্ডেল, জলঢাকা, ফরাক্কা, বক্রেশ্বর ইত্যাদি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা কিছুই নয়। যদি প্রতিবছর ২১০ মেগাওয়াটের একটা করে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র খোলা যায় তবে হয়তো এই চাহিদার কিছুটা মোকাবিলা করা সম্ভব হয় (*State Industrial Profile* পৃঃ ৮৪)। বেকার সংখ্যারও তেমনই উর্ধ্বগতি (১৯৮৭-৮৮তে ৬.২ শতাংশ)। তবে কেরালার মতো প্রকট নয় (ওই একই সময়ে ১৭.৩ শতাংশ)।



কালীঘাটের কালী

শিক্ষার দিক থেকেও রাজ্য অনেকখানি এগিয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে রাজ্যে ৪২.৯ হাজার প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ছিল। ১৯৮৭-৮৮ তে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫১ হাজার।

১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে নয়—কলকাতা (১৮৫৭), বিশ্বভারতী (১৯৫১), যাদবপুর (১৯৫৫), বর্ধমান (১৯৬০), কল্যাণী (১৯৬০), উত্তরবঙ্গ (১৯৬২), রবীন্দ্রভারতী (১৯৬২), বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪) ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৪)। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ও বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (শিবপুর, হাওড়া) বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে।

উপসংহার—গঙ্গারিডির সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় বাঙালি আজ যেখানে পৌঁছেছে অনেকেই তার জন্য বেশ চিন্তিত। নৃবিজ্ঞানী অতুল সুর বলেছেন : 'অশন-বসনে, আচার-ব্যবহারে বাঙালী আজ যেমন নিজেকে বহুরূপী করে তুলেছে, তেমনই বর্ণচোরা করেছে তার সংস্কৃতিকে। অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতির পরিবর্তে এক জারজ সংস্কৃতির প্রাবল্যই লক্ষিত হচ্ছে।' একথা তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের বিরুদ্ধেই বলেছেন, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ঘটাতে বলেননি। আর সেটা সম্ভবও নয় কারণ, 'যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই, ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে; . . .' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)। কিন্তু এ হতাশার কারণ কী? সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। তিনি বলতে চেয়েছেন আপাতদৃষ্টিতে আজ যা ক্ষয়িষ্ণু, হতাশজনক আসলে তা অসম্পূর্ণতারই প্রতীক, অসম্পূর্ণ সংস্কৃতিরই লক্ষণ, 'আমাদের নৈসর্গিক পরিপার্শ্বিক ও ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে।' তাই এক্ষেত্রে তাঁর মতে অতীত পর্যালোচনাই সর্বাপেক্ষা জরুরি কর্তব্য—'আমরা পূর্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি।'

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ

আয়তন : ৮৮৭৫২ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

জনসংখ্যা : ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৭০ হাজার (১৯৯১)

জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৭৬৭ প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

প্রধান ভাষা : বাংলা

বনাঞ্চল (মোট জমির) : ১৩.৪৯ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৬২.৪৪ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৯৭.৩১ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

কৃষিতে নিযুক্ত লোকসংখ্যা (শতাংশে) : ৪৯.৭৪ (১৯৯১)

বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ২৮,৮০৬ টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)

বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ২৯১টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)

বিভাগের সংখ্যা : ৩ (১৯৯৬)

জেলার সংখ্যা : ১৮ (১৯৯৬)

রাজধানী : কলকাতা

বিমানবন্দর : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দমদম; কোচবিহার এবং বাগডোগরা।

নৌবন্দর : কলকাতা এবং হলদিয়া বন্দর (মেদিনীপুর)

সাক্ষরতা : ৫০.৭০ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫১০২১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮৪৪৩, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫৭৪, মহাবিদ্যালয় ৩১৫, বিশ্ববিদ্যালয় ৯

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ৩৩৭৮ (১৯৯৪)

সড়ক : জাতীয় সড়ক ১৬৩১ কিলোমিটার, রাজ্য সড়ক ৩৪৫৫ কিলোমিটার, পি. ডব্লু. রাস্তা : (১) পাকা রাস্তা ১৬৫৫৭ কিলোমিটার (১৯৯৪), (২) কাঁচা রাস্তা ৮১০ কিলোমিটার (১৯৯৪)।

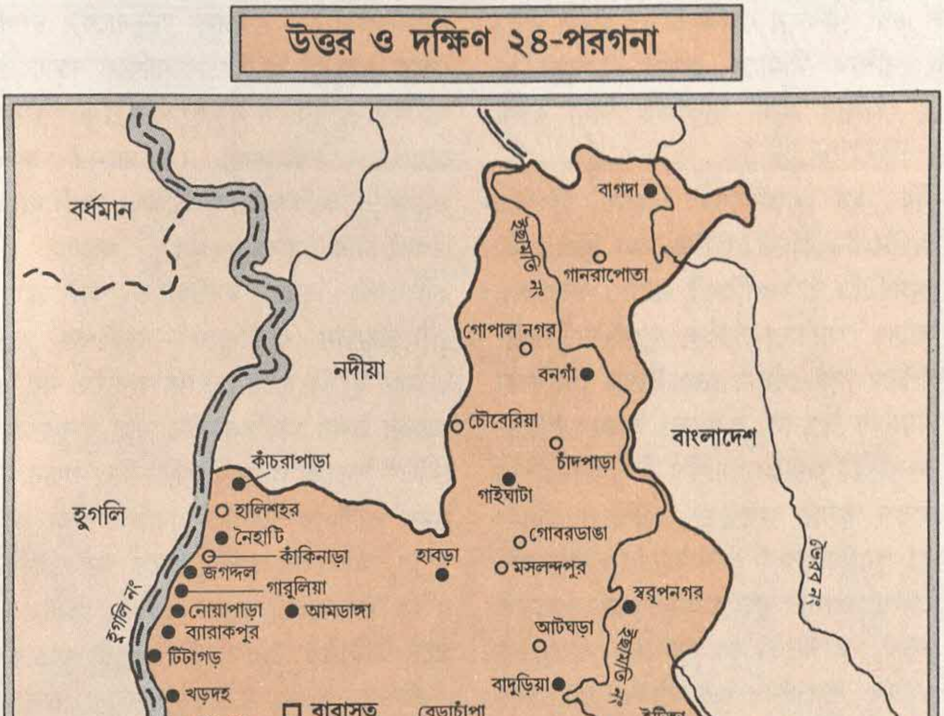
মহকুমার সংখ্যা : ৫৯ (১৯৯৬)

থানার সংখ্যা : ৪২৬ (১৯৯৬)

বাংলার জাতীয় পাখি : দোয়েল

বাংলার জাতীয় পশু : হরিণ

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Statistical Handbook, West Bengal*, 1996; *State Industrial Profile*, Small Industries Service Institute, 1996-97.



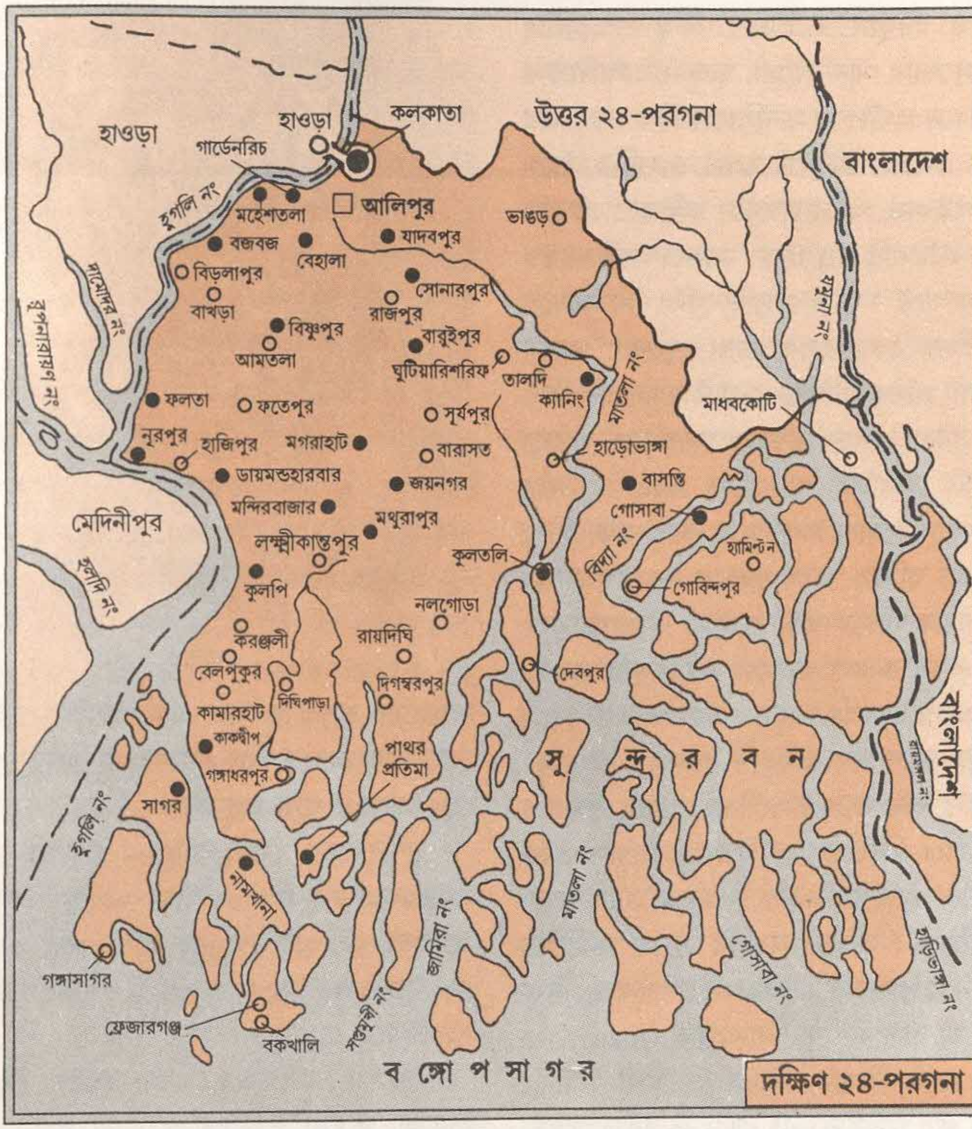
১৫ জুলাই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। তৎকালীন বাংলার নবাব মিরজাফর এই তারিখে কলকাতার দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত এলাকার মধ্যে ২৪টি পরগনার জমিদারি সত্ত্ব ভোগ করতে দেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। সেই থেকে চলে আসছে ২৪-পরগনা নামটি।

২৪-পরগনা জেলাটি ১মার্চ ১৯৮৬ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় জেলা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। জেলার (অন্যকিছু না বলা থাকলে উভয় জেলার সমগ্র ভূভাগ বুঝতে হবে) উত্তরে নদীয়া, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমে কলকাতা ও হুগলি নদী। এই নদী পশ্চিম সীমান্তে হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে প্রাকৃতিক সীমা রচনা করেছে।

খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীতে গ্রিসের বিখ্যাত ভূগোলবিদ টলেমি- রচিত 'ট্রিটিজ অন জিওগ্রাফি' গ্রন্থে যে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিদাই জাতির কথা বলা হয়েছে তাদের আবাসস্থল ছিল পূর্বে ভাগীরথী-হুগলি, পশ্চিমে পদ্মা-মেঘনা এবং উত্তরে গঙ্গা-পদ্মা চিহ্নিত সীমানার অন্তর্বর্তী অঞ্চলে। আজকের ২৪-পরগনা জেলা এই অঞ্চলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ। দেগঙ্গা থানার অন্তর্ভুক্ত বেড়াচাঁপা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সাপেক্ষে বলা যায় যে, এই জেলা সরাসরি গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত না হলেও খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত শাসনের সাংস্কৃতিক প্রভাব এড়াতে পারেনি। এই জেলা গৌড়রাজ শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। তবে মনে করা হয় বর্তমান ২৪-পরগনা জেলা, যা ছিল প্রাচীন বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চল, ধর্মপালের (শাসনকাল আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দ) রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, যদিও পাল রাজাদের কেন্দ্রীয় শাসন এই অঞ্চলে যথেষ্ট সুদৃঢ় ছিল না। কারণ পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, অথচ বৌদ্ধ ধর্মের কোনো নিদর্শন জেলায় আবিষ্কৃত হয়নি। সেন আমলের বহু দেবদেবী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

২৪-পরগনা জেলার অনেক জায়গার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে (১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ)। এইসময় গৌড়েশ্বর ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ)। উল্লিখিত জায়গাগুলি ছিল ভাগীরথী-হুগলির পুরোনো খাতের বাম তীরবর্তী অঞ্চলে। বর্তমানে এই খাতের নাম আদিগঙ্গা। চাঁদসদাগর (*মনসামঙ্গল* অনুসারে) চম্পকনগরী থেকে যাত্রা শুরু করে, তাঁর বাণিজ্য সম্ভারে পূর্ণ তরী ভাসিয়ে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ধরে চলার সময় পার হয়েছিলেন কুমারহট্ট (বর্তমানের হালিশহর), ভাটপাড়া, কাকিনাড়া, মুলাজোড়,গারুলিয়া, ইছাপুর, দিগঙ্গা-চনক (ব্যারাকপুর), খড়দহ, চিতপুর, কলিকাতা এবং কালীঘাট। কালীঘাট থেকে পৌঁছেছিলেন বারুইপুরে। বারুইপুর ভাগীরথীর বর্তমান হুগলি খাতের উপর অবস্থিত নয়, এর মরা খাতের উপর অবস্থিত। এই মরা খাতই আদিগঙ্গা। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সরস্বতী ছিল প্রধান নদী। এই সময় পর্যন্ত ভাগীরথীও প্রবাহিত ছিল আদিগঙ্গার খাতে, আজকের হুগলি খাতে নয়। কবি-কর্ণপুর রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে রচিত) গ্রন্থে উল্লিখিত চৈতন্যদেবের পুরী যাত্রার বর্ণনায় একইভাবে পাওয়া যায় ২৪-পরগনা জেলার অনেক জায়গার নাম। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উল্লিখিত জায়গাগুলির নামের সঙ্গে তুলনা করলে ভাগীরথীর তীরে ২৪-পরগনার এই জায়গাগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহাতীত ধারণা তৈরি হয়। চাঁদসদাগর বারুইপুরে (আদি) গঙ্গাতীরবর্তী মনসামন্দির লুট করেন এবং চৈতন্যদেব বারুইপুরের কাছে অতিসরাতে অনন্ত পণ্ডিতের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ডায়মন্ডহারবার মহকুমার মথুরাপুর থানা অঞ্চলে ছিল ছত্রভোগ বন্দর। এখান থেকে চৈতন্যদেব ভাগীরথীর পশ্চিম পারে যান। সেখান থেকে পুরী। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নদীপথগুলির একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল পর্তুগিজ জলদস্যুরা। পরবর্তী একশো বছর তারা তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল বিশেষত দক্ষিণ ২৪-পরগনা, সদর এবং উত্তর ২৪-পরগনার বসিরহাট অঞ্চলে। এই সময় এদের ভয়ে অনেক সমৃদ্ধশালী জনপদ জনশূন্য হয়ে যায়।



যশোররাজ প্রতাপাদিত্য পর্তুগিজদের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। সাগরদ্বীপ, সরশুনা (কলকাতার দক্ষিণে), জগদ্দল (উত্তর ২৪-পরগনা) প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্গ বানিয়ে ছিলেন এদের গতি রোধ করার জন্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে এক শক্তিশালী ভূস্বামী হিসাবে প্রতাপাদিত্য যশোর, খুলনা, বরিশালসহ সমগ্র ২৪-পরগনার অধিপতি ছিলেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের হাতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটলে, মুঘলদের উপকারী বন্ধু হিসাবে নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার এবং বড়িশার (কলিকাতার দক্ষিণে) সাবর্ণ চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার (গাঙ্গুলি)-এর ভাগ্য খুলে যায়। কালীঘাটের কালীমন্দির নির্মাণের ব্যাপারে প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায়ের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্তের আগেই যোগাযোগ ঘটেছে এবং সেই সময় থেকে প্রতাপাদিত্যের অধীনে একটা

চাকুরিতেও নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলার সুবেদার মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ বাঁধলে লক্ষ্মীকান্ত মানসিংহের পক্ষ নেন। এর প্রতিদানে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁকে মাগুরা, পাইকান, আনোয়ারপুর, কলিকাতা প্রভৃতি পরগনার জমিদারি সত্ত্ব প্রদান করেন। লক্ষ্মীকান্তের নাতি কেশবচন্দ্র মজুমদার মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে সমগ্র দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং খুলনার রাজস্ব আদায়কারী জমিদার নিযুক্ত হন। তাঁর কাছারি তিনি এই সময় বিরাটি থেকে বড়িশায় স্থানান্তরিত করেন।

গোটা জেলাটাই পলিগঠিত সমভূমি। উত্তর থেকে দক্ষিণে সামান্য ঢালু। মরা নদীর খাত, জলা, বিল, বাঁওড় ছড়িয়ে আছে জেলার মধ্যভাগ জুড়ে। নদীয়া সীমান্ত ঘেঁষে এই জেলার অংশকে মৃত-বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বিস্তৃতি হাবরা-বনগাঁ রেলপথের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত। এরপর থেকে (আমডাঙা-স্বরূপনগর সমভূমি অঞ্চল) বারাসত-বসিরহাটের পরিণত ব-দ্বীপ বিস্তৃত হয়েছে সুন্দরবন পর্যন্ত। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে *ড্যাম্পিয়ার* ও *হজেস* নামক দুইজন সার্ভে অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত '*ড্যাম্পিয়ার-হজেস রেখা*'-র দক্ষিণে অবস্থিত সক্রিয় ব-দ্বীপের অংশের নাম সুন্দরবন। সুন্দরবনের কর্দমাক্ত, সিক্ত বনাঞ্চল, যা 'বাদাবন' বা 'ম্যানগ্রোভ' (mangrove forest) নামে বিখ্যাত, উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্রে পৃথিবীতে প্রায় অদ্বিতীয়। এই বাদাবনই রয়াল বেঙ্গল, টাইগারের মতো বাঘের বাসভূমি। গরান, গেওয়াঁ, সুঁদরি, গর্জন, হেঁতাল, গোলপাতা প্রভৃতি সুন্দরবন অরণ্যের বিশিষ্ট গাছপালা। এই বনে লালমুখো বানর থেকে শুরু করে খেঁকশিয়াল পর্যন্ত বিচিত্র সব প্রাণীদের বাস। পাখিও তেমনিই নানা রকমের—গোদাচিল, চন্দনা, চোখগেল, বাতাসি ও আরও কত কী। কুমির তো আছেই। আর আছে হুগলি নদী ও অসংখ্য খাড়িতে গাঙ্গেয় ডলফিন এবং বঙ্গোপসাগরে



বনবিবি

দেখা যায় শুশুক ও আর এক প্রজাতির ডলফিন। জোয়ারের জলের সঙ্গে কলকাতার গঙ্গাতেও এরা চলে আসে কখনো কখনো।

সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় ৮ হাজার বর্গমাইল। এর মধ্যে ৭ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর এলাকার বন ২৪ পরগনার মধ্যে পড়ে এবং এই জেলাভুক্ত বনভূমির মধ্যে ১৬২৯ বর্গমাইল বনাঞ্চল সংরক্ষিত।

জেলার নদীগুলির মধ্যে হুগলি, বিদ্যধরী, পিয়ালি, মাতলা, ইছামতি ও যমুনা প্রধান। হুগলি নদী জেলার পশ্চিম সীমানা ঘেঁষে প্রবাহিত। বাকি নদীগুলি গঙ্গা-পদ্মার শাখানদী হিসাবে একসময় চিহ্নিত হলেও এখন আর তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। জোয়ার-ভাটার জলেই মূলত এদের বাঁচা-মরা। ফলে বেশিরভাগ নদীর জল লবনাক্ত এবং চাষের কাজে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। জেলার দক্ষিণাংশে কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে জমিকে লবনাক্ত জল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়। লবনযুক্ত জমি

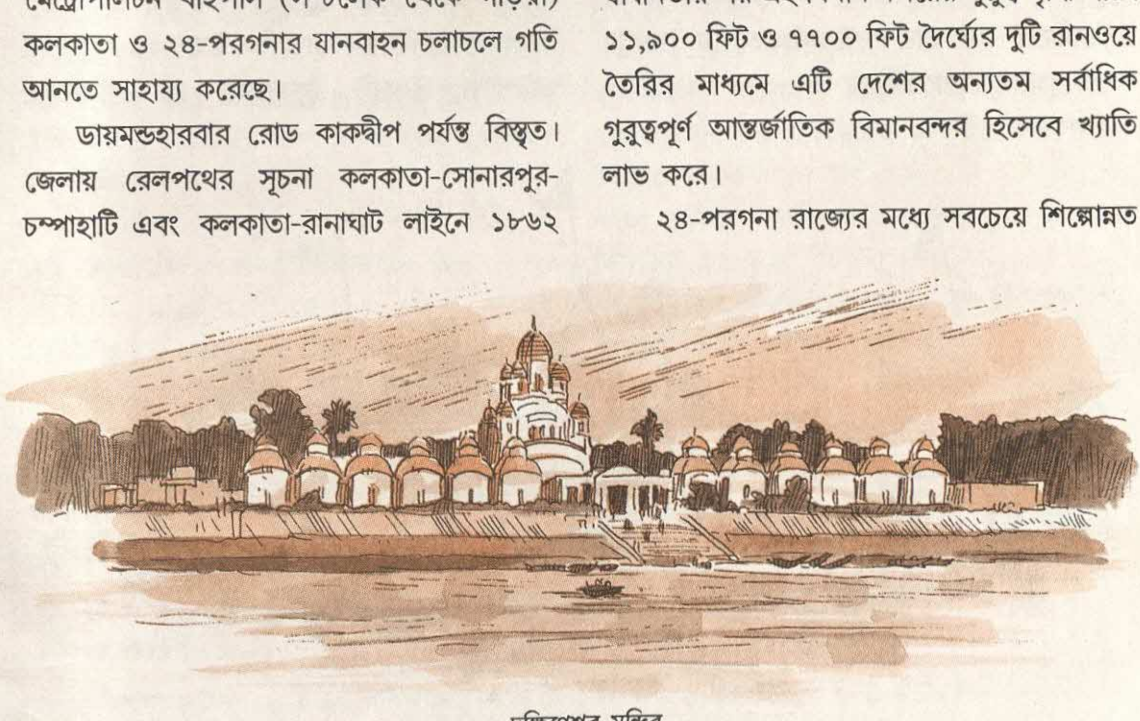
হাঁসিল করে আবাদ তৈরি করে আসছে মানুষ বহুকাল। এই আবাদ চাষের উপযোগী। জেলায় ধান, পাট, আখ, পান, তামাক ও নানা রকমের শাকসবজির চাষ হয়। আমন, আউস ও বোরো এই তিন ধরনের ধানই চাষ করা হয় এই জেলায়।

শ্রীচৈতন্যের যাত্রাপথ অনুসরণ করে বলা যায় মধ্যযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনার মধ্যে স্থল ও জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালো ছিল। মানসিংহ স্থলপথেই যশোরে গিয়েছিলেন (শ্যামনগর হয়ে) প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা এসেছিলেন যে পথ ধরে তার নাম ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। সাম্প্রতিককালে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি ব্যারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করেছে (যানবাহন চলাচল শুরু ৩. ৫. ১৯৮২ থেকে)। সি.এম.ডি. এ.-র ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস (সল্টলেক থেকে গড়িয়া) কলকাতা ও ২৪-পরগনার যানবাহন চলাচলে গতি আনতে সাহায্য করেছে।

ডায়মন্ডহারবার রোড কাকদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। জেলায় রেলপথের সূচনা কলকাতা-সোনারপুর-চম্পাহাটি এবং কলকাতা-রানাঘাট লাইনে ১৮৬২ সালে। পরের বছরই সোনারপুর থেকে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত এই লাইনের বিস্তৃতি ঘটে। বালিগঞ্জ-বজবজ সেকশনের লাইন চালু হয় ১. ৫. ১৮৯০ তারিখে। দমদম জংশন থেকে বনগাঁ পর্যন্ত রেলপথ পর্যায়ক্রমে চালু হয়, দত্তপুকুর পর্যন্ত ২ এপ্রিল ১৮৮৩, দত্তপুকুর থেকে গোবরডাঙ্গা ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৩, এবং গোবরডাঙ্গা থেকে বনগাঁ পর্যন্ত ২২ এপ্রিল ১৮৮৪-র তারিখে। জেলায় বর্তমানে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩১৩ কিলোমিটার। দক্ষিণেশ্বর হয়ে একটা লাইন হুগলি নদীর উপর দিয়ে বালির কাছে মেইন লাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং আর একটা লাইন নৈহাটি দিয়ে হুগলি নদী পার হয়ে মেইন লাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যান্ডেলে।

১৯২৪ সালে দমদম বিমান বন্দরের গোড়াপত্তন ছিল একদমই তাৎপর্যহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৬০০০ ফিট রানওয়ে তৈরি হয়। স্বাধীনতার পর এই বিমান বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১১,৯০০ ফিট ও ৭৭০০ ফিট দৈর্ঘ্যের দুটি রানওয়ে তৈরির মাধ্যমে এটি দেশের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

২৪-পরগনা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে শিল্পোন্নত



দক্ষিণেশ্বর মন্দির

জেলা। এই জেলাতেই কর্মরত কারখানার সংখ্যা সর্বাধিক। ১৯৯২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৫৩৯। তুলনামূলকভাবে একই সময়ে হাওড়া জেলায় এই সংখ্যা মাত্র ১৯৮৯। হুগলি নদীর পূর্ব পাড়ে নৈহাটি, জগদ্দল, টিটাগড়, বজবজ প্রভৃতি স্থানে পাট, কাপড়, কাগজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিল্পের কারখানাগুলি অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে জেলার কয়েকটি নামকরা বড়ো শিল্পকারখানার উল্লেখ করা যেতে পারে। অ্যান্ড্রুইউল কোম্পানি (ঠাকুরপুকুর), অ্যাভেরি ইন্ডিয়া লিমিটেড (হাইড রোড), বাটা (বাটানগর), ব্রিটানিয়া (তারাতলা রোড), ক্লোরাইড ইন্ডিয়া (শ্যামনগর), গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ইত্যাদি। জেলার নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের ভূমিকাও জেলার সার্বিক অর্থনীতিতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই জেলায় ৯১ শতাংশের বেশি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। এরপর হিন্দিভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উর্দুভাষীদের স্থান তারপরেই। সাঁওতালিরা জেলায় পঞ্চম বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী।

ধর্মের দিক থেকে নদীয়া সংলগ্ন জেলার উত্তরাংশ বৈষ্ণবপ্রধান। পানিহাটি ও খড়দহের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে (জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্য-ভাগবত*)। যদিও শিব ও শক্তির আরাধনা জেলার সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। খড়দহেই ২৬টি শিবের মন্দির রয়েছে। সমস্ত জেলায় যে দেবদেবীরা পূজিত হন তাঁরা হলেন চণ্ডী, অন্নপূর্ণা, বিশালাক্ষী, বনবিবি, পির, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি। চড়ক-গাজন, রথযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, শিবরাত্রী প্রভৃতি উপলক্ষে জেলার সর্বত্র প্রায় সারাবছরই মেলা হয়। সাগরদ্বীপে মকর সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর মেলা হয়। এই মেলায় সারা ভারতবর্ষ থেকে সাগরে স্নান করতে আসেন হাজার হাজার মানুষ।

জেলার কতকগুলি জায়গা ঐতিহাসিক স্থান নামের তালিকাভুক্ত হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্র ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত ছিল উত্তর ২৪-পরগনার ভাটপাড়া, নৈহাটি, কুমারহট্ট বা হালিশহর,



গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রম

মুলাজোড় প্রভৃতি জায়গা। সিপাহি বিদ্রোহের (১৮২৪ ও ১৮৫৭) সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যারাকপুরের নাম। কাকদ্বীপ, সোনারপুর, ভাঙড় প্রভৃতি জায়গাগুলি ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৬-১৮৮৬) নাম, হালিশহরের সঙ্গে সাধক রামপ্রসাদ (আনুমানিক ১৭২০-১৭৮১), কাঁঠালপাড়ার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), মজিলপুরের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) নাম।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর নামে সম্প্রতি (১৯৯৫) তৈরি হয়েছে তাঁর জন্মস্থান, বনগাঁর অদূরে চালকি-ব্যারাকপুর গ্রামে ৬৪ হেক্টর এলাকা জুড়ে 'বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য'। পর্যটকদের জন্য স্থানটি আকর্ষণীয়। সুন্দরবন অঞ্চলে বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জের সৈকতভূমি পর্যটকদের জন্য মনোরম জায়গা।

এক নজরে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা

আয়তন : উত্তর ২৪-পরগনা ৪০৯৪ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১), দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৯৯৬০ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

জনসংখ্যা : উত্তর ২৪-পরগনা ৭২ লক্ষ ৮২ হাজার (১৯৯১), দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৫৭ লক্ষ ১৫ হাজার (১৯৯১)

জনসংখ্যার ঘনত্ব : উত্তর ২৪-পরগনা ১৭৭৯/বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১), দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৫৭৪/বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

বনাঞ্চল (উভয় জেলা) : ২৯.১৯ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র পাঁচ বছরের গড়)

কৃষিযোগ্য জমি (উভয় জেলা) : ৪৪.৪০ শতাংশ (মোট জমির; ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র পাঁচ বছরের গড়)

কর্ষিত জমি (উভয় জেলা) : ৯৮.০০ শতাংশ (কৃষিযোগ্য জমির; ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র পাঁচ বছরের গড়)

কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : উত্তর ২৪-পরগনা ৩৩.৬০ শতাংশ (১৯৯১), দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৫৩.১০ শতাংশ (১৯৯১)

বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : উত্তর ২৪-পরগনা ১৪৮২ (১৯৯৪), দক্ষিণ ২৪-পরগনা ১৭৩৬টি (১৯৯৪)

বিদ্যুৎযুক্ত শহর (উভয় জেলা) : ৭৪ (১৯৯৪)

সাক্ষরতা : উত্তর ২৪-পরগনা ৬৬.৮১ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি), দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৫৫.১০ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি)।

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : উত্তর ২৪-পরগনা ২৬৯ (১৯৯৪), দক্ষিণ ২৪-পরগনা ১৯৭ (১৯৯৪)

পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য (উভয় জেলা) : ২৩৭০ কিলোমিটার (১৯৯৪ পি. ডব্লু. রাস্তা)

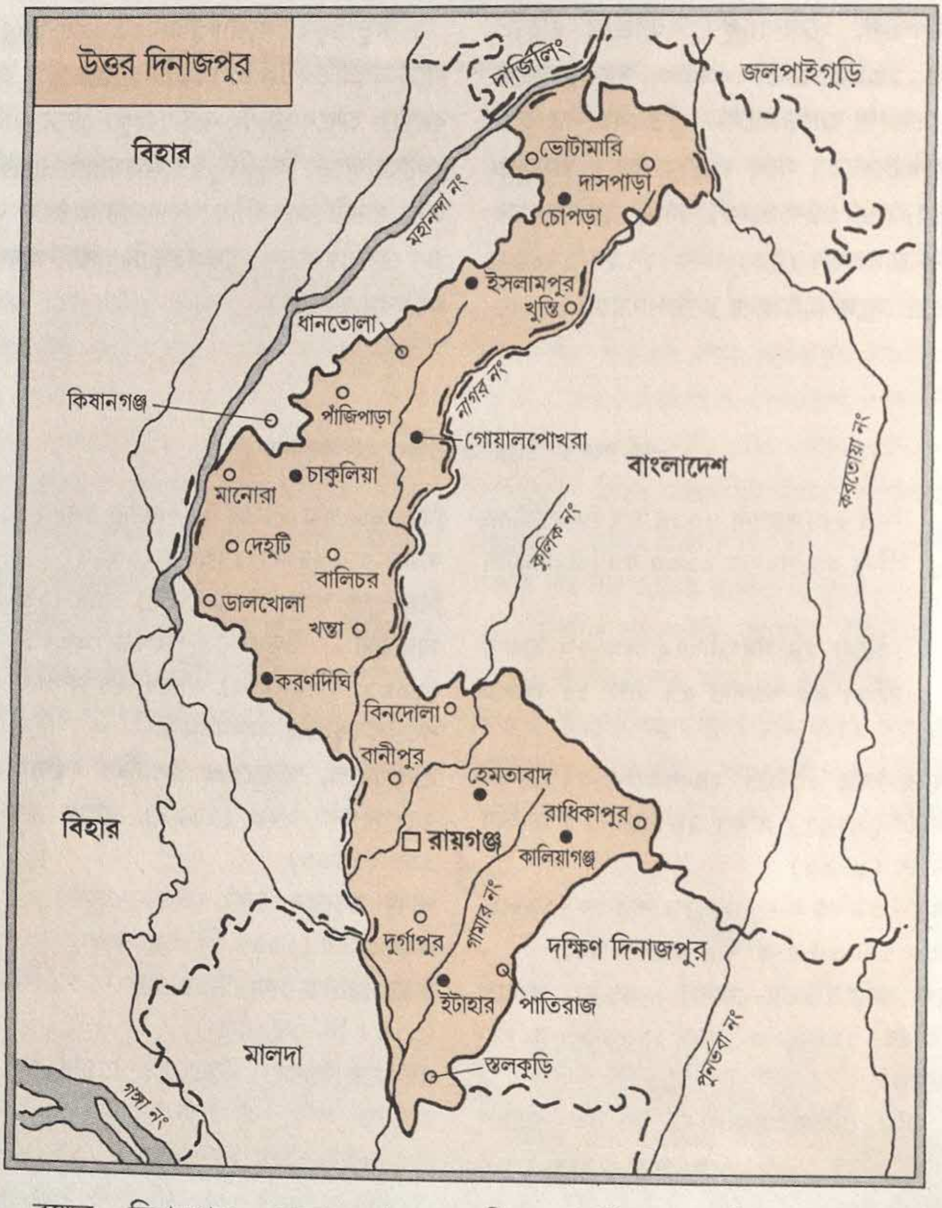
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য (উভয় জেলা) : ১৯ কিলোমিটার (১৯৯৪ পি. ডব্লু. রাস্তা)

মহকুমার সংখ্যা : উত্তর ২৪-পরগনা ৫ (১৯৯৬) বারাসত সদর, বসিরহাট, ব্যারাকপুর, বনগাঁ ও বিধাননগর। দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৫ (১৯৯৬) ডায়মন্ড-হারবার, আলিপুর সদর, ক্যানিং, বারুইপুর, কাকদ্বীপ।

থানার সংখ্যা : উত্তর ২৪-পরগনা ৩৩ (১৯৯৬), দক্ষিণ ২৪-পরগনা ৩১ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, N. & S. 24 Parganas, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর



অবিভক্ত বঙ্গের দিনাজপুর জেলা মালদহ (পশ্চিমবঙ্গ) ও বগুড়া (বাংলাদেশ) জেলার অনেকখানি অংশ এবং পুর্নিয়া (বিহার), রাজশাহি (বাংলাদেশ) ও রংপুর (বাংলাদেশ) জেলার বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। অতি প্রাচীনকালে দিনাজপুর ছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মৌর্য যুগে (খ্রি.পূ. ৩২২-২৯৮) পুণ্ড্রবর্ধনে একজন মৌর্য রাজকর্মচারী অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁর উপাধি ছিল 'মহামাত্র'। বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে অধুনা মহাস্থানই ছিল এই মহামাত্রের অধিষ্ঠান

কেন্দ্র। এই যুগের বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে উল্লিখিত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয় (জেলা) ও পঞ্চনগরী বিষয় যথাক্রমে আজকের বাণগড় (গঙ্গারামপুর থানায়) ও পঞ্চনগর (কুশমন্ডি থানায়)। এই অঞ্চল গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। পাল ও সেন যুগের ঐতিহাসিক চিহ্নস্বরূপ আজও মহীপাল দিঘি, মালিয়ান দিঘি, তপন দিঘি ছড়িয়ে আছে এই জেলার বুকে। পুরোনো পুকুর সংস্কার করবার সময় উঠে আসা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি সেই যুগের ভাস্কর্যের পরিচয় বহন করে। সুলতানি আমলে (১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি নবদ্বীপ জয় করার পর থেকে শুরু) তদানীন্তন দেবকোটেই (বর্তমান গঙ্গারামপুর) শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। বাংলার সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ দিল্লির সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে চিরামতি ও বালিয়া নদীর আবেষ্টনীর মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন একদালা দুর্গ। হুশেন শাহ ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা হলে তিনি তাঁর রাজধানী গৌড়নগরী থেকে একদালায় স্থানান্তরিত করেন। সুলতানি যুগে একমাত্র হিন্দুরাজা গণেশ (১৪১৫-১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ) 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি নিয়ে গৌড়েশ্বর হয়ে বসেন। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে এই 'দনুজ' নামটি ফরাসি ঐতিহাসিকদের উচ্চারণে দিনজ বা দনোজ হয়ে যায়। কালক্রমে ওই শব্দ থেকে জন্ম নেয় দিনাজপুর নামটি।

মুঘল শাসনাধীনে বঙ্গদেশের প্রায় দুশো বছরের ইতিহাসে (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) দিনাজপুর অপেক্ষাকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলার সঙ্গে দিনাজপুরেরও ঘনিয়ে আসে দুর্দিন। করের বোঝার চাপে চারিদিকে বিক্ষোভ ঘনিয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ (প্রকৃত অর্থে কৃষক বিদ্রোহ) ঘটে। ১৯২০ সালে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত হলে সরকারিভাবে দিনাজপুরকে 'বিক্ষুব্ধ জেলা' বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরকে দু-টুকরো করা হল। ভারতের অংশের নাম হল পশ্চিম দিনাজপুর। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে এই জেলার ভৌগোলিক সীমা ও আয়তনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। ১৯৪৮ সালেও জেলার দুইটি (বালুরঘাট ভেঙে) মহকুমা ছিল—রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট। ১৯৫৬ সালে বিহারের পুর্নিয়া জেলার কিছু অংশ নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশের আয়তন বৃদ্ধি করা হয় এবং ইসলামপুর নামে একটি নতুন মহকুমারও জন্ম হয় এইসঙ্গে। এই জেলাকে ১৯৯২ সালের এপ্রিল থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এই দুটি জেলায় আলাদা করা হয়েছে। জেলার (কিছু না বললে উত্তর ও দক্ষিণ মিলিতভাবে বুঝতে হবে) উত্তরে দার্জিলিং, পূর্বে বাংলাদেশের দিনাজপুর ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে মালদহ ও বাংলাদেশের রাজশাহি জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদহ ও পশ্চিমে বিহারের পুর্নিয়া জেলা। জেলাটি জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

পুরো জেলাটাই প্রায় পলিগঠিত সমভূমি, ক্রমশ দক্ষিণে ঢালু। দক্ষিণ-পশ্চিমভাগের মাটি দোয়াঁশ পলিযুক্ত। 'খেয়ার অঞ্চল' বলে পরিচিত জেলার পূর্বাঞ্চলের মাটি কাঁকরযুক্ত। এই মাটিতে ভালো ধান চাষ হয়। জেলার উত্তর-পশ্চিমে ছোটো ছোটো পাহাড় দেখা যায়। জেলার প্রধান নদী মহানন্দা জেলার উত্তর সীমায় কিছুটা দূরত্ব প্রবাহিত হয়ে বিহারে ঢুকেছে। বিহার ঘুরে উত্তর দিনাজপুরের

ইটাহার থানার মধ্য দিয়ে আবার জেলায় প্রবেশ করেছে। অপর উল্লেখযোগ্য নদী নাগর ইসলামপুর মহকুমার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এ ছাড়া আছে পুনর্ভবা, আত্রাই, কুলিক, টাঙ্গন প্রভৃতি নদী। কৃষিকাজে জলসেচের জন্য এই নদীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কাজে প্রাচীনকাল থেকে দিঘিগুলির ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জেলাটি কৃষিপ্রধান। ধান, পাট, তৈলবীজ, গম, আখ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কৃষিফসল। সবচেয়ে বেশি জমিতে ধান চাষ হয়, তারপর সবচেয়ে বেশি চাষ হয় তৈলবীজ এবং তৈলবীজের পর পাট চাষের স্থান। গভীর প্রাকৃতিক অরণ্য এখানে কিছু নেই। চোপড়া ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলে সামান্য কিছু বন দেখা যায়।

শিল্পে জেলাটি অনগ্রসর। কিছু ধানকল আছে। ফলে কৃষি মানুষের প্রধান জীবিকা।

এই জেলায় পরিবহন ব্যবস্থা মূলত সড়ক প্রধান। রেলপথ খুবই কম। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা সদর হলেও এর নিকটতম রেল স্টেশন ৯৬ কিলোমিটার দূরে কালিয়াগঞ্জে অবস্থিত। ফরাক্কা সেতুর উপর দিয়ে নতুন ব্রডগেজ লাইন নিউ জলপাইগুড়ি ছুঁয়ে অসম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। জেলার ভিতর দিয়ে কোথাও কোথাও এই রেল সড়ক চলে গেছে কিন্তু কোথাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ শহর এটি ছোঁয়নি। সীমান্ত শহর হিলির পুরোনো রেল স্টেশন দেশ ভাগের পর বাংলাদেশে চলে গেছে। একমাত্র ৩৪নং জাতীয় সড়ক, যা কলকাতা থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত বিস্তৃত, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে হিলি, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ প্রভৃতি শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করেছে। সড়ক পরিবহনের এই দুর্বলতা দূর করার জন্য 'বেঙ্গল টু বেঙ্গল' রাস্তা তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ১৯৮৮ সালে। এখনও দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে যেতে হলে বিহারের কিষাণগঞ্জ জেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ৩৪নং জাতীয় সড়ক ডালখোলায় এসে ৩১নং জাতীয় সড়কে মিশেছে। এই জাতীয় সড়কটি (৩৪নং) কিষাণগঞ্জ হয়ে আবার উত্তর দিনাজপুর জেলায় ঢুকেছে। এইটি ছাড়া শিলিগুড়ি পৌঁছোনোর বিকল্প কোনো পথ নেই। বিহারে কোনো কারণে বন্ধ হলে শিলিগুড়িসহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকী একই জেলায় সদর থেকে ইসলামপুর পৌঁছোতে সেই বিহারের উপর দিয়েই যেতে হয়। তা ছাড়া উত্তর দিনাজপুরের



বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বেশ কয়েকটি ব্লকের যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রায় কিছু নেই। তাই এই 'বেঙ্গল টু বেঙ্গল' রাস্তা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তা রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দেবে ৩৫ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে পৌঁছোতে এক ঘণ্টা সময় কমে যাবে। এই রাস্তাটি শুরু হয়েছে রায়গঞ্জের কাছে বোতলবাড়ি রসাখোয়ায় এবং শেষ হয়েছে ইসলামপুরের কাছে বনতলায় ৩১নং জাতীয় সড়কে। বালুরঘাটে একটা বিমান অবতরণ ক্ষেত্র আছে।

জেলার ৭২ শতাংশের উপর লোক বাংলাভাষী। উর্দু ১০ শতাংশ লোকের মাতৃভাষা। উর্দুভাষীদের সমাবেশ দেখা যায় গোয়ালপোখোর, চোপড়া ও ইসলামপুর থানা অন্তর্ভুক্ত এলাকায়। এরপরই সাঁওতালভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বালুরঘাট থানা এলাকায় এদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের কথ্য ভাষা যে বাংলা তা প্রচলিত বাংলা থেকে পৃথক। উদাহরণ দিলে এই উপভাষা সম্পর্কে ধারণাটা স্পষ্ট হবে: হ্যাপতে হ্যাপতে খাটিয়াটা কহতে, উলাত খাটা করছে—উলা কি কোই খায়? (হাঁপাতে হাঁপাতে শেয়াল বললে, ওগুলো (আঙুর ফল) কি কেউ খায়? ওগুলো তো টক।)

জেলায় তপশিলি জাতির মধ্যে বৃহত্তর রাজবংশীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। পালিয়া, দেশিয়া, কোচ ও রাজবংশী নিয়ে এই বৃহত্তর রাজবংশী সমাজ গঠিত। এরা হিন্দু সমাজভুক্ত। ধর্মের দিক থেকে হিন্দুর পরে মুসলমানরাই সংখ্যায় বেশি। মুসলমানরাই যেহেতু উর্দুভাষী তাই উর্দুভাষী অঞ্চলই মুসলমান প্রধান অঞ্চল। বিভিন্ন পিরের মেলায় ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ যোগ দেয়। অন্যদিকে রাজবংশী সমাজ আয়োজিত 'ক্ষণ গান', 'নটুয়া গান', 'বোলভাই গান'-এর অনুষ্ঠানে মুসলমান সমাজের মানুষরাও সমান আনন্দ উপভোগ করেন।



কুলিক বার্ড স্যাংচুয়ারি

উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জ শহরের কাছে মহানন্দার শাখানদী কুলিক ও আশপাশের জলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কুলিক অভয়ারণ্য। এটি আসলে একটি পাখিরালয়। একসময় এই জেলার বিলগুলিকে ঘিরে প্রচুর হিজলের বন ছিল। সবই লুপ্ত হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। এখন তার জায়গায় মানুষের তৈরি কুলিক অভয়ারণ্যে জারুল, ছাতিম, কদম, মেহগিনিরা নতুন করে মাথা তুলেছে। তাতে পানকৌড়ি, শামুকখোর, রাতচরা, বক ইত্যাদি পাখির বাসা। এরা জুন মাসে আসে আর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অতিথি হয় এই জঙ্গলে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহর থেকে অল্প দুরে বাণগড়। রায়গঞ্জ শহর থেকে বাস ধরে আসলে বাণগড়ের দূরত্ব ৯৪ কিলোমিটার। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে খননকার্য চালানো হয়েছিল (১৯৩৮-৪১ খ্রিস্টাব্দে) তার ফলে পাওয়া গিয়েছিল মৌর্য যুগ ও মুসলিম

যুগের নানান পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই খননকার্য চালাবার সময় মাটির নীচে থেকে বেরিয়ে পড়েছে সেই যুগের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে অসংখ্য মূর্তি, লিপি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির নিদর্শন ইত্যাদি। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' আদি পর্ব গ্রন্থে বাণগড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সমস্ত বাণগড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি জুড়িয়া এক বৃহৎ সমৃদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিস্তৃত। ...ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমান হয়, এই নগর দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮০০ এবং প্রস্থে ১৫০০ ফুট বিস্তৃত ছিল, নগরটি চারিদিকে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত এবং প্রাকারের পরেই পূর্বে, উত্তর ও দক্ষিণে পরিখা এবং পশ্চিমে পুনর্ভবা নদী। নগরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এখনও একটি সুউচ্চ স্তূপ বর্তমান এবং জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও এই স্তূপ রাজবাড়ি নামে জাগ্রত...।'

দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যতম পুরা নিদর্শন তপন দিঘি গঙ্গারামপুর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আরও দুটি দিঘি কালোদিঘি ও ধলোদিঘি বাণগড় থেকে হাঁটা দূরত্বের মধ্যে।

ইতিহাস সচেতন পর্যটকদের কাছে বাণগড় আজ তাই বাংলার ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল।

এক নজরে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর

আয়তন : উ. দিনাজপুর : ৩১৮০ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১) দ. দিনাজপুর : ২১৮৩ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

জনসংখ্যা : উ. দিনাজপুর ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার (১৯৯১) দ. দিনাজপুর ১২ লক্ষ ১ হাজার (১৯৯১)

জনসংখ্যার ঘনত্ব : উ. দিনাজপুর ৬০৬ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১) দ. দিনাজপুর ৫৫০ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

বনাঞ্চল : (দুই জেলা একসঙ্গে) ০.৩৫ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত পাঁচ বছরের গড়)

চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : (উভয় জেলা একসঙ্গে) ৮৭.৮৬ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত পাঁচ বছরের গড়)

কর্ষিত জমি (চাষযোগ্য জমি) : (উভয় জেলা একসঙ্গে) ৯৯.২৭ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত পাঁচ বছরের গড়)

বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : উ. দিনাজপুর ১২৩৩ (৩১. ৩. ৯৪ দ. দিনাজপুর ১১৪৪ (৩১. ৩. ৯৪)

বিদ্যুৎযুক্ত শহর : (উভয় জেলা একসঙ্গে) ৮ (৩১. ৩. ৯৪)

কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : (উভয় জেলা একসঙ্গে) ৭৪.১০ (১৯৯১)

সাক্ষরতা : (উভয় জেলা একসঙ্গে) ৩৯.২৯ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (উভয় জেলা) হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ১৬৪ (৩১. ৩. ৯৪)

পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : (উভয় জেলা) ৮৫৯ কিলোমিটার (৩১. ৩. ৯৪)

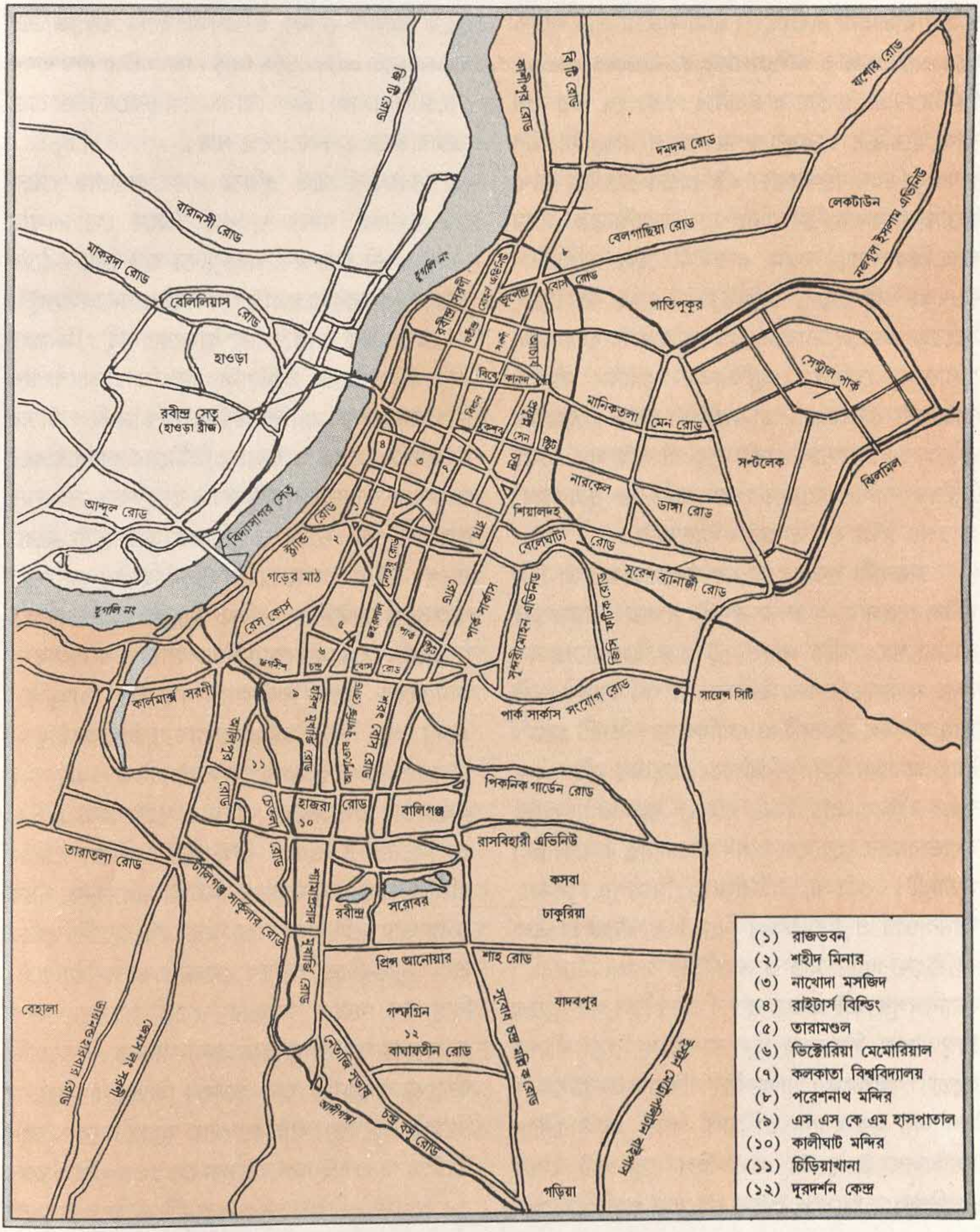
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : (উভয় জেলা) ৮৪ কিলোমিটার (৩১. ৩. ৯৪)

মহকুমার সংখ্যা : উত্তর দিনাজপুর ২ (১৯৯৬) ইসলামপুর, রায়গঞ্জ সদর; দক্ষিণ দিনাজপুর ১ (১৯৯৬) বালুরঘাট সদর

থানার সংখ্যা : উত্তর দিনাজপুর ৯ (১৯৯৬); দক্ষিণ দিনাজপুর ৮ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। *Dist Statistical Handbook, N. & S. Dinajpur, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

কলকাতা


বারানসী রোড
মাকরদা রোড
বেলিলিয়াস রোড
হাওড়া
রবীন্দ্র সেতু
(হাওড়া ব্রীজ)
আন্দুল রোড
বিদ্যাসাগর সেতু
হুগলি নদী
দমদম রোড
বেলগাছিয়া রোড
লেকটাউন
যশোর রোড
পাতিপুকুর
সেন্ট্রাল পার্ক
মানিকতলা মেন রোড
সল্টলেক
ঝিলমিল
নারকেল ডাঙ্গা রোড
শিয়ালদহ
বেলেঘাটা রোড
সুরেশ ব্যানার্জী রোড
গড়ের মাঠ
রেস কোর্স
পার্ক সার্কাস
সায়েন্স সিটি
পার্ক সার্কাস সংযোগ রোড
কার্লমার্ক্স সরণী
পিকনিক গার্ডেন রোড
হাজরা রোড
বালিগঞ্জ
রাসবিহারী এভিনিউ
তারাতলা রোড
টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কসবা
ঢাকুরিয়া
রবীন্দ্র সরোবর
প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
যাদবপুর
বেহালা
গল্ফগ্রিন
১২
বাঘাযতীন রোড
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু রোড
গড়িয়া
১০
১১
(১) রাজভবন
(২) শহীদ মিনার
(৩) নাখোদা মসজিদ
(৪) রাইটার্স বিল্ডিং
(৫) তারামণ্ডল
(৬) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
(৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
(৮) পরেশনাথ মন্দির
(৯) এস এস কে এম হাসপাতাল
(১০) কালীঘাট মন্দির
(১১) চিড়িয়াখানা
(১২) দূরদর্শন কেন্দ্র

কলকাতা বাংলার ষষ্ঠ রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল গৌড় (মালদহ দ্রষ্টব্য), দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়া, তৃতীয় রাজধানী রাজমহল। মানসিংহ বাংলার শাসক হয়ে এলে গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে ৭ নভেম্বর, ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে এই তৃতীয় রাজধানীর পত্তন হয়, এর নাম রাখা হয়েছিল আকবর নগর। চতুর্থ রাজধানী ছিল ঢাকা (১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ)। এই রাজধানীর নাম রাখা হয়েছিল তৎকালীন দিল্লিশ্বর জাহাঙ্গিরের নামে জাহাঙ্গিরনগর। পঞ্চম রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ (১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত)। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে, ইংরেজ আমলে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এইসময় থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত শুধু বাংলাই নয়, সমগ্র ইংরেজ শাসিত ভারতের রাজধানী হয় কলকাতা। তারপর দিল্লি হয় ভারতের রাজধানী।

রাজধানী হওয়ার অনেক আগে কলকাতা ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটি সাধারণ গ্রাম। এই গ্রামের গায়ে গায়ে আরও দুটি গ্রাম ছিল যাদের বাদ দিয়ে কলকাতার জন্ম ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। এই গ্রাম দুটি হল সুতানুটি ও গোবিন্দপুর। তিনটি গ্রামের মোট আয়তন ছিল পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় এক মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল। বর্তমান চিতপুর, শোভাবাজার ধরে বাগবাজার খাল পর্যন্ত এলাকা ছিল সুতানুটি। ধর্মতলা, বউবাজার, মির্জাপুর, সিমলা, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে ছিল কলকাতা এবং হেস্টিংস, গড়ের মাঠ ও ভবানীপুর অঞ্চল নিয়ে ছিল গোবিন্দপুর। এই অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তে ছিল লবণ হ্রদের বিস্তৃত জলা, শিয়ালদহ ছিল তার মধ্যে কিছুটা দ্বীপের মতো। পশ্চিমে ভাগীরথী। শিয়ালদহ-বউবাজার অঞ্চলের মুখ থেকে ভাগীরথী পর্যন্ত একটা নৌকা চলাচলের উপযোগী খাল ছিল। সুতানুটি থেকে গোবিন্দপুরে আসতে গেলে এই খাল পার হতে হত। শিয়ালদহের ক্রিক রো রাস্তাটি সেই পুরোনো খালের স্মৃতি বহন করছে। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ঝড়ে গঙ্গাবক্ষ থেকে অনেক নৌকা ও একটা বড়ো জাহাজ এই খালের মধ্যে এসে ভেঙে পড়ে। জায়গাটার নাম তখন থেকে ডিঙাভাঙা। ক্রিক রো-র মধ্যে ঢুকলে ডিঙাভাঙা নামের রাস্তা এখনও দেখা যায়।

সরস্বতীর খাত শুকিয়ে এলে সপ্তগ্রাম থেকে শেঠ-বসাকরা গঙ্গার পূর্বপাড়ে এসে গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করে এবং সতানুটিতে হাট বসায়। এঁদের এখানে আসার আগে এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলপূর্ণ। বন কেটে তাঁরা বসত বসায়, আজকের শহীদ মিনারের কাছে ছিল তাঁদের তাঁতিশালা এবং তার আশেপাশে ছিল আবাদ। বর্তমান লালদিঘির পশ্চিমে ছিল তাঁদের বসতবাটি। কাপড় ও অন্যান্য জিনিসের কারবার করে শেঠ-বসাকরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। সেই সময় কলকাতা ছিল সাবর্ণ চৌধুরিদের জমিদারির মধ্যে। সাবর্ণ চৌধুরি বংশের শুরুতে ছিলেন কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি খুব পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম প্রচার করে বেড়াতেন। মানসিংহ এঁর শিষ্য হয়েছিলেন। কামদেবের ছেলে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার (গাঙ্গুলি)। এঁদের গোত্র ছিল সাবর্ণ এবং পাওয়া উপাধি চৌধুরি। (উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই সময় কলকাতায় ইংরেজদের আগমন ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (১৬০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত) একজন সাধারণ কর্মচারী জব চার্নক, যাঁকে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলে ধরা হয়, হুগলি থেকে প্রথম সুতানুটিতে পদার্পণ করেন ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সে যাত্রায় বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁকে কলকাতায় তাদের স্থায়ী আস্তানা গাড়তে দিতে রাজি করাতে পারেননি জব চার্নক। ইতিমধ্যে ইংরেজ বিরোধী শায়েস্তা খাঁর জায়গায় নবাব হয়ে এলেন ইব্রাহিম খান। এই নবাবের আমলে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট, রবিবার চার্নক সুতানুটিতে ফিরে আসেন।

এই নিয়ে জব চার্নকের সুতানুটিতে তৃতীয়বার আগমন ঘটল। এরপর জব চার্নককে আর ফিরে যেতে হয়নি। এই কারণে এই তারিখটাকেই কলকাতা শহরে ইংরেজ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা দিবস ধরা হয়।

জব চার্নক মারা যান ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তাঁর বড়ো জামাই, চার্লস আয়ারের হাতে কলকাতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ১৩০০ টাকার বিনিময়ে ইংরেজরা কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর, এই তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কিনে নেয় নবাব আজিমুশ-শানকে খুশি করে। প্রথমদিকে এই জায়গাগুলি সাবর্ণ চৌধুরিরা ইংরেজদের বিক্রি করতে চায়নি, এমনকী দিল্লির সম্রাটের কাছে আজিমুশ-শানের বিরুদ্ধে নালিশ করবেও বলেছিল। পরে ব্যাপারটা আজিমুশ-শানের তৎপরতায় শান্তিপূর্ণভাবে মিটে যায় এবং চার্লস আয়ারের নেতৃত্বে এই তিনটি গ্রামে প্রজা বসিয়ে খাজনা আদায়ের অধিকার পায় ইংরেজ। ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য তখন ভালো চলছিল না। ফলে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করেই তারা সেই ক্ষতি পূরণ করতে চেয়েছিল।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা নবাব হলে তিনি কলকাতা আক্রমণ করেন এবং কলকাতায় ইংরেজ আধিপত্যের পতন ঘটে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি, পলাশির যুদ্ধে ইংরেজের হাতে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর কলকাতায় আবার ইংরেজ আধিপত্য ফিরে আসে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট দিল্লির মোঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি সনদ লাভ করে। এর ফলে ইংরেজরা প্রথমে বণিক, তারপর জমিদার এবং শেষে শাসক পর্যায়ে উন্নিত হল। কলকাতা হল তাদের শাসনকেন্দ্র।

ইংরেজ আমলের যে সময়টাকে রজনী পাম দত্ত তাঁর 'India Today' বইতে বণিকপুঁজির কাল বলেছেন সেই সময়টাকে (১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ) চিহ্নিত করা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত থেকে সরাসরি লুটের যুগ বলে। এরপর ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮-র মধ্যে (ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর) ভারতকে ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরি কাপড়ের বাজার হিসাবে এবং ইংল্যান্ডের কারখানায় ব্যবহারের জন্য কাঁচামালের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্যের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে ইংরেজরা আর এক ঔপনিবেশিক লুটের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল এই রাজধানী শহর কলকাতাতে বসেই। অর্থাৎ কলকাতা ইংরেজদের হাতে শহর হয়ে উঠেছিল তার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে, তার বণিক মনে কলকাতার জন্য অন্য কোনো অর্থে জায়গা ছিল না। তাই কলকাতা আজও রয়ে গেল হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ছত্রাকের মতো দিশাহীন।

কলকাতা বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ৮৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এক সময় এই জায়গা সুন্দরবনের অংশ ছিল। ক্রমে সেই বন মাটিতে বসে যায়। আধুনিককালে বিভিন্ন জায়গা খোঁড়াখুঁড়ির সময় তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। আজ সেই জায়গায় পথঘাট, বড়ো বড়ো বাড়ি, লোকজন, জমজমাট মহানগরী। তার বয়সও হয়ে গেল ৩০০ বছর। তার মাটির তলা দিয়ে এখন চলছে পাতাল রেল, যা ভারতে আর কোথাও নেই। ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তায় (এসপ্ল্যানেড-ভবানীপুর সেকশানে) প্রথম পাতাল রেল চালু হয়। এখন দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাতাল রেল চলছে। কলকাতার জনপরিবহনে রেলপথের গুরুত্ব অনেকখানি। এই মহানগরে ১২টা রেললাইন ২৩০ কিলোমিটার রাস্তায় নিত্যযাত্রী পরিবহনে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। মহানগর অন্তর্বর্তী ৮৫টা রেল স্টেশনের মধ্যে হাওড়া ও



ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল

শিয়ালদহ এই দুটি স্টেশনেই ভীষণ ভিড়ের চাপ। হাওড়া ব্রিজ (রবীন্দ্র সেতু) যা কলকাতার সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের প্রতীক, তৈরি হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু) ১৯৯৩ সালের জুন মাসে চালু হবার পর হাওড়া ব্রিজের উপর যানবাহনের চাপ অনেকটা কমেছে। ডায়মন্ডহারবার রোড, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড প্রভৃতি পুরোনো রাস্তাগুলি চওড়া করা হয়েছে, নতুন রাস্তাও হয়েছে, যেমন ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস, ফ্লাইওভার হয়েছে কয়েকটি : ব্রাবোর্ন রোড ফ্লাইওভার, শিয়ালদহ ফ্লাইওভার ইত্যাদি। কিন্তু কলকাতার আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলে এ আয়োজন যথেষ্ট নয়।

১৯৬১-৭১ এবং ১৯৭১-৮১ এই দুই দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২২.৫ শতাংশ ও ৩০.৩৫ শতাংশ। ১৯৮১-৯১ দশকে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩৩ শতাংশ। ফলে টোকিও, মেক্সিকো এবং মুম্বাইয়ের পরে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম জনবহুল শহর এই কলকাতা। সম্প্রতি প্রকাশিত সি এম ডি এ-র এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫১ সালে কলকাতায় মোট অধিবাসীর ৬৬ শতাংশ ছিল বাঙালি। ১৯৯৭ সালে সেটা কমে হয়েছে ৫৭.৫ শতাংশ। এই ৪৬ বছরে কলকাতায় হিন্দি ও উর্দুভাষী জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৭ থেকে ৩৯ শতাংশ। (*আনন্দবাজার*, ২৫.৩.৯৯)।

কলকাতায় বায়ুদূষণও অত্যধিক। সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক দূষণযুক্ত শহর হিসাবে কলকাতা পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

ডা. বিধানচন্দ্র (১৮৮২-১৯৬২) রায় কলকাতার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ১৯৬১ সালে গঠন করেন কলকাতা পরিকল্পনা সংস্থা CMPO (*Calcutta Metropolitan Planning Organisation*)। CMPO এখন লুপ্ত। তার জায়গায় ১৯৭০ সালে গঠিত হয়েছে CMDA (*Calcutta Metropolitan Development Authority*) বা বৃহত্তর

কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা। সি এম ডি এ-র আওতাধীন রয়েছে জলসরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা, রাস্তা ও পরিবহন, এলাকা উন্নয়ন ও বস্তি সংস্কার। এ তো গেল আজকের কথা, শুরুতে (১৯১২ সালে) কলকাতার উন্নতির জন্য তৈরি হয় কলকাতা ইম প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। এই ট্রাস্ট কলকাতায় তৈরি করে সেন্ট্রাল এভিনিউ (চিত্তরঞ্জন এভিনিউ), পার্কস্ট্রিট, থিয়েটার রোড, রাসবিহারী এভিনিউ ইত্যাদির মতো বড়ো বড়ো রাস্তা, এর হাতেই জন্ম নেয় ঢাকুরিয়া লেক। রাস্তাঘাট বানানো ছাড়াও গরিবদের জন্য সস্তায় বাড়ি নির্মাণ, পার্ক তৈরি ইত্যাদি কাজের ভার ছিল এই ট্রাস্টের হাতে।

ইংরেজ যুগের স্মারক হিসেবে ছড়িয়ে আছে কলকাতার বুকে অনেক ঐতিহাসিক বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠান এবং দর্শনীয় জায়গা। এ ছাড়াও আছে সেই যুগের কিছু মন্দির, মসজিদ, গির্জা। রাজভবন তৈরি হয়েছিল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির আমলে। এটি ডার্বিশায়ারে লর্ড কার্জনের পৈত্রিক বাড়ি কেড়্লস্টোন হলের অনুকরণে নির্মিত। হাইকোর্ট বেলজিয়ামের Ypres-এ অবস্থিত বিখ্যাত টাউন হলের আদলে নির্মিত হয়েছিল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। রাইটার্স বিল্ডিংস বা আধুনিক মহাকরণ গথিক স্থাপত্য রীতিতে তৈরি। ১৮২০-২১ সাল থেকে মহাকরণের বর্তমান অলংকৃত রূপায়ণ আরম্ভ হয়। ভারতীয় জাদুঘর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল ইটালিদেশীয় নির্মাণকৌশল অনুসরণে। এটি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের (১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রতিষ্ঠিত) প্রয়োজনেই তৈরি করা হয়েছিল। বড়ো ডাকঘর *GPO— General Post Office* নির্মাণের কাজ শেষ হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। এর গম্বুজটির করিন্থীয় (গ্রিক স্থাপত্য) স্তম্ভ আছে। ১৬৫ ফিট উঁচু (অকটরলোনি মনুমেন্ট) শহীদমিনার তৈরি হয়েছিল ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে। এর নির্মাণ কৌশলে মিশরীয় (ভিত), সিরীয় (স্তম্ভ) এবং তুর্কি (গম্বুজ) স্থাপত্যরীতির ব্যবহার হয়েছে। এর ভিতরে ২১৮টি সিঁড়ির ধাপ আছে। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হতে ১৫ বছর লাগে, শেষ হয় ১৯২১ সালে। ইটালীয় রেনেসাঁস ও মুঘল স্থাপত্য রীতির যৌথ প্রয়োগ দেখা যায় এর নির্মাণে। রাজস্থানের মাকরানা সাদা মার্বেল পাথর, যা আগ্রার তাজমহল তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছিল, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বহিরঙ্গ তৈরিতে সেই পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। বিড়লা তারামণ্ডলের গম্বুজটি সাঁচির বৌদ্ধস্তুপের অনুকরণে নির্মিত। জনসাধারণের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত করা হয় ১৯৬২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের (১৮১৯-৮৭) উদ্যোগে আলিপুর পশুশালার (চিড়িয়াখানা) জন্ম হয় ১৮৭৬ সালে। এই রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের ১৮৩৫ সালে তৈরি মার্বেল প্যালেস কলকাতার মধ্যে আজও সবচেয়ে জমকালো বাড়ি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের সূচনা হয় কলকাতা শহরে। প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ব্ল্যান্ডফোর্ড ১৮৭৫ সালে যে পরিকল্পনা রচনা করেন সেই অনুসারে আলিপুর মানমন্দির স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ সাল থেকে কলকাতায় 'দৈনিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস' প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতার রেসকোর্স-এর নির্মাণ কাল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ। কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির হল কালীঘাটের কালীমন্দির। এ ছাড়া আছে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী ও শিব মন্দির, বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালীমন্দির ইত্যাদি। মসজিদের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলের টিপু সুলতানের বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, চিৎপুরের নাখোদা মসজিদ (আগ্রায় আকবরের সমাধীর অনুকরণে



কলকাতায় কয়েকটি দেখার জিনিস

নির্মিত) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার প্রাচীনতম গির্জাটি হল চীনাবাজারের আর্মেনিয়ান গির্জা, স্থাপিত ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ওল্ড মিশন চার্চ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গির্জায় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি কবি মধুসূদন দত্তকে জর্ডন নদীর পবিত্র জল মাথায় সিঞ্চন করে মাইকেল নাম দিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল গির্জা (নির্মাণকাল ১৮৩৯-৪৭, প্রধানত গথিক রীতির স্থাপত্য) কলকাতার সবচেয়ে উঁচু গির্জা।

জওহরলাল নেহেরু তাঁর 'Discovery of India' বইতে অনেকদিন আগে লিখেছিলেন, 'উনবিংশ শতাব্দির বাংলায় এমন কিছু সংখ্যক মানুষ জন্মেছিলেন যাঁরা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সারা ভারতবর্ষের পথ প্রদর্শক ছিলেন...'। এঁদের এই প্রদর্শিত পথকেই ইতিহাসে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া

হয়েছিল। কলকাতা ছিল তার পটভূমি। এই পথপ্রদর্শকরা ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) , ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), রামতনু লাহিড়ি (১৮১৩-১৮৯৮), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যাঁরা এই রেনেসাঁসের পুরোভাগে ছিলের তাঁরা হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। শুধু কলকাতারই নয় সারা ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু কলেজ ছিল প্রথম। এই হিন্দু কলেজ থেকে জন্ম নেয় প্রেসিডেন্সি কলেজ, আবার একথাও বলা যায় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৭ সাল) জন্ম নেয় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সংস্কৃত কলেজ (১৮২৬), মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫ থেকে ক্লাস শুরু), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৮৯৪), জাতীয় গ্রন্থাগার (১৯৪৭ সালের পর বেলভেডিয়ার হাউসে স্থানান্তরিত হয়) প্রভৃতি। এইভাবেই কলকাতা হয়ে উঠেছিল 'পশ্চিমী প্রত্যয় ও প্রাচ্যাভিমান'-এর (সুশোভন সরকার, *প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ*) পীঠস্থান। সেই পীঠস্থানে সাধক ও সাধনার ধারাবাহিকতা আজও নিরন্তর স্রোতে বহমান। শুধু নোবেল পুরস্কার দিয়েই ব্যাপারটা দেখা যাক : প্রথম ভারতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (১৯০২) রোনাল্ড রস (১৮৫৭-১৯৩২) কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনেরাল হসপিটালে (এখনকার এস এস কে এম হসপিটাল) বসেই ম্যালেরিয়ার জীবানু আবিষ্কার করেন ১৮৯৭ সালে। এরপর কলকাতার দ্বিতীয় নোবেল বিজেতা (১৯১৩) হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তৃতীয় নোবেল বিজয়ী (১৯৩০) স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন (১৮৮৮-১৯৭০)। কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স-এ আলোর উপর গবেষণা *(Raman Effect)* চালিয়ে তিনি এই পুরস্কার পান। এই শহরের চতুর্থ নোবেল বিজেতা হলেন মাদার টেরেসা (১৯১০-১৯৯৭)। ইনি নোবেল পান শান্তির জন্য। সম্প্রতি এই গৌরব (১৯৯৮) আর একবার কলকাতার জন্য এনে দিলেন অমর্ত্য সেন (১৯৩৩ সালে জন্ম)। অর্থনীতিতে তাঁকে নোবেল দেওয়া হয়।

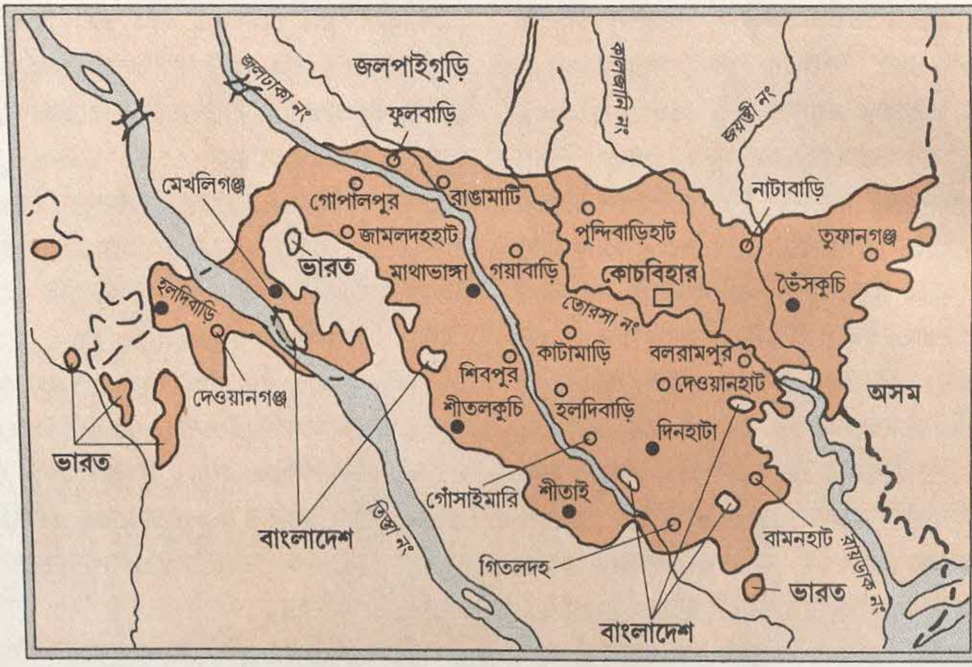
এই শহর নিয়ে পৃথিবীর খ্যাতনামা কয়েকজন লেখক বইও লিখেছেন। তার মধ্যে ডোমিনিক ল্যাপিয়েরার 'সিটি অফ জয়', জিওফ্রে মুরহাউসের 'ক্যালকাটা' ইত্যাদি বইয়ের নাম করা যেতে পারে। তবে রুডিয়ার্ড কিপলিঙের 'এ টেল অফ টু সিটিস' কবিতাটি কলকাতাকে নিয়ে সাহেবদের কাব্য করার প্রথম নমুনা হিসাবে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

এক নজরে কলকাতা

আয়তন : ১৮৫ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)	**বোরো কমিটির সংখ্যা** : ১৫
জনসংখ্যা : ৪৪ লক্ষ (১৯৯১)	**থানার সংখ্যা** : ৩৬ (১৯৯৬)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ২৩৭৮৪/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)	**হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা** : ১৯৫ (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
সাক্ষরতা : ৭৭.৬১ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি)	**পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য** : ১৫২৫ কিলোমিটার (১৯৯৬)
ওয়ার্ডের সংখ্যা : ১৪১	**কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য** : ২৩৫ কিলোমিটার (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Calcutta, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

কোচবিহার



প্রাচীনকালে কোচবিহার নামে কোনো দেশ ছিল না। কোচবিহার বলতে আজকে যে অঞ্চল বোঝায় একসময় সেটি ছিল বৃহত্তর কামরূপ রাজ্যের অংশবিশেষ। কামরূপের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় সমুদ্রগুপ্তের (খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে। পরবর্তীকালে কামরূপ ভেঙে দু-টুকরো হলে এর পশ্চিম অংশের নাম হয় কামতাপুর। এই কামতাপুরই আজকের কোচবিহার। হিমালয়ের পাদদেশে কোচ, মেচ প্রভৃতি যে আদিম পার্বত্য জাতি বাস করত তাঁদের নাম থেকেই কোচবিহার নামের উৎপত্তি। কোচবিহার নামের অর্থ হল কোচদের বাসস্থান।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের রাজকীয় অব্দের আরম্ভ। ভুটান, অসম, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যেও এই অব্দের প্রচলন হয়েছিল। এই বছরেই কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বলে অনুমান করা হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজার নাম বিশ্ব সিংহ। কোচবিহার রাজাদের নামের সঙ্গে নারায়ণ যুক্ত হত। বিশ্ব সিংহের পুত্র নরনারায়ণ নারায়ণী মুদ্রার প্রচলন করেন। এই মুদ্রার এক পিঠে দেবনাগরী অক্ষরে মহাদেবের নাম অপর পিঠে নরনারায়ণের নাম উৎকীর্ণ ছিল। এই টাকা কোচবিহার ও তার আশপাশের অনেক রাজ্যে প্রচলিত হয়েছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ী র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে এই দেশ ভ্রমণ করেন। এঁর লেখা বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই রাজ্যে ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, পাখি প্রভৃতির হাসপাতাল ছিল, এটি ছিল একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। ভুটানরাজের সঙ্গে সংঘর্ষে ইংরেজ (ওয়ারেন হেস্টিংস) কোচবিহাররাজকে শর্তসাপেক্ষে সাহায্য করে। এই শর্তবলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার ইংরেজের অধীনে একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর ভারত



বাণেশ্বর শিবমন্দির

রং ধূসর। এই মাটি উর্বর এবং চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এই জেলার উত্তরে অল্প পরিমাণ বন আছে। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী জেলায় মোট ৪৩.৮৪ বর্গ কিলোমিটার বন আচ্ছাদিত অঞ্চল রয়েছে। এই বনে শাল, শিরিষ, খয়ের, শিশু প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। জেলার প্রধান নদীগুলি হল তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা ও কালজানি। নদীগুলি উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত। জেলাটির উত্তরে জলপাইগুড়ি, পূর্বে অসম রাজ্য ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বাংলাদেশ ও জলপাইগুড়ি জেলা, পশ্চিমে বাংলাদেশ। কোচবিহার জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা।

রেল ও সড়ক পথের দ্বারা কলকাতার সঙ্গে এই জেলা যুক্ত। নতুন জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহার শহরের কাছে নতুন কোচবিহার স্টেশন পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইনে ট্রেন চলে। এই রেলপথে অসম পর্যন্ত যাওয়া যায়। মিটারগেজ লাইনের রেলপথ আলিপুরদুয়ার থেকে কোচবিহার শহর হয়ে দিনহাটা এবং বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন কলকাতা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত সরাসরি বাস চালায়। কলকাতা থেকে এই জেলার জন্য সরাসরি অনেকগুলি এক্সপ্রেস ট্রেন রয়েছে।

সরকারের সঙ্গে তৎকালীন কোচবিহাররাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের চুক্তি অনুসারে এই রাজ্যের শাসনভার ভারত সরকারের হাতে আসে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা বলে ঘোষিত হয়।

জেলার ভূমিগঠন মুখ্যত সমতল। দক্ষিণ-পূর্বে সামান্য ঢালু। কোথাও কোথাও জমি ঢেউ খেলানো। কোথাও এত নিচু যে বর্ষায় প্লাবিত হয়। এই জেলায় কোনো পাহাড়পর্বত নেই। অতি সাম্প্রতিক কালের সঞ্চিত পলি দিয়ে গঠিত এই জেলার ভূভাগ। মাটিতে কাদার ভাগ নেই বললেই চলে। জমির উপরিভাগে খুব বেশি হলে তিন ফুট পুরু দো-আঁশ মাটি পাওয়া যায়। তার নীচে কেবল বালি। মাটির

জেলার প্রধান কৃষি ফসল ধান। পাট, তামাক, ডাল, গম, সরষে, আখ ইত্যাদিও চাষ হয়। এখানকার তামাক খুব উৎকৃষ্ট মানের। চামা বা কুলাপাতি, বড়ো মেনি, ছোটো মেনি প্রভৃতি নানা জাতীয় তামাকের চাষ হয়। একসময় রংপুরের (বাংলাদেশ) তামাকের সঙ্গে কোচবিহার তামাকের উৎকর্ষ নিয়ে প্রতিযোগিতা হত। শিল্পে কোচবিহার একটি পশ্চাদপদ জেলা। এখানকার এন্ডি কাপড়

বিখ্যাত। ভেরেন্ডা গাছে এন্ডি পোকার চাষ হয়। এই এন্ডি পোকার দেহনির্গত সুতাই এন্ডি কাপড় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এদেশের মাটিতে মৃৎপাত্র তৈরি করা যায় না। সামান্য কয়েক জায়গার মাটি ইট তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়।

জেলার ৯৬ শতাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। তারপরই হিন্দিভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আসা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মানুষ, যারা প্রধানত নগর-শহরে বাস করে, তারাই হিন্দিভাষী, তপশিলভুক্ত জাতি রাজবংশিরাই জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। অজ্ঞাত কোনো উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন এঁরা। পরে হিন্দু হয়েছেন। কোচবিহারের রাজভাষা বাংলা ছিল। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন অসমরাজকে লেখা এক চিঠিতে কোচবিহাররাজের ব্যবহৃত প্রাঞ্জল বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই গদ্যের নমুনা আছে তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে লেখা কোচবিহারের রাজা ও রানির চিঠিগুলিতে। নরনারায়ণের রাজত্বকালে (ষোড়শ শতাব্দী) 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' বাংলায় অনুদিত হয়। এই সময় কবি শংকরদেব রচিত 'রামবিজয় নাটক' বাংলায় লেখা হয়েছিল। তিনি অসম থেকে কোচবিহার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এই জেলার গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গ্রামবাসীর ঘর মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে তৈরি হয়। আবার কোনো কোনো বাড়িতে চতুষ্কোণ উঠানের চারিদিকে চারটি ঘর বিন্যস্ত থাকে। এবং এই জেলায় মানুষ মাটিতে শোয় না। যার তক্তপোশ নেই সে বাঁশের মাচায় শোয়। বিশেষত বর্ষাকালে যখন মাটি বেশি আর্দ্র হয়। তখন খালি পায়ে হাঁটাচলা করলে 'পদতল ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়'। ফলে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পায়ে খড়ম ব্যবহার করে (*ভারত কোষ*-এ উল্লিখিত প্রবন্ধ অনুসারে)।

জেলা শহর কোচবিহারকে ঘিরে রয়েছে তোরসা নদী। বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে প্রাচীন কোচবিহারের রাজধানী হিসাবে এইরকম একটি স্থানকে নির্বাচন করা হয়েছিল। বর্তমান রাজপ্রাসাদটি রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক



দ্বিতীয় গৃহমাধবের মন্দির

নির্মিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। মহকুমা শহর দিনহাটার কাছে গোঁসানীমারিতে (গোঁসাইমারি) পর্যটকরা রাজপাট দেখতে যায়। এটি একটি উঁচু ঢিবি। এটি খ্যেন রাজবংশের রাজা নীলধ্বজ বা কান্তেশ্বরের রাজপাটের ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান। এই জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমায় রসিকবিল নামে জলাভূমিতে জলচর ও বন্য পাখির সমাবেশ দেখা যায়। এখানকার পাখির মধ্যে পানকৌড়ি, খুন্তেবক, কোঁচবক, সরাল, বড়ো দিঘর, ফিঙে হরবোলা, লালকণ্ঠী টিয়া, রাজশকুন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই জলাভূমিতে নৌবিহারের ব্যবস্থাও আছে।

এই জেলায় কয়েকটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে কোচবিহার শহরের ভিক্টোরিয়া কলেজ অন্যতম। এটি শহরের অন্যতম আকর্ষণ সাগরদিঘির কাছে অবস্থিত। এই কলেজে প্রখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে (১৮৬৪-১৯৩৮) ১৮৯৬ সালে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ সরাসরি অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করেন। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে পড়িয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য এই কলেজের নাম পরিবর্তন করে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয় করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বিভাগে চাকরি নিয়ে ১৮১৩ সালে কলেক্টর ডিগবি সাহেবের কর্মচারী হিসাবে কোচবিহারে আসেন ও কিছুদিন কাজ করেন।

বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান এই জেলা। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, চটকা ও মাহুত বন্ধুর গান এই সংস্কৃতির চিহ্ন হিসেবে এই জেলায় এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়। এ ছাড়াও রাজবংশী মেয়েদের হুদুম (বৃষ্টির দেবতা) পূজার সময় হুদুম গান উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টি আনতে এই গান গাওয়া হয়। মহকুমা শহর মাথাভাঙায় সরস্বতী পূজার দিন থেকে শুরু হয়ে সারস্বত উৎসবে চটকা, ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালি গানের প্রতিযোগিতা চলে আট দিন।

এখানে উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলির মধ্যে কোচবিহার শহরের রাজপরিবার প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন মন্দির এবং বাণেশ্বর শিব মন্দির অন্যতম। মদনমোহন মন্দিরে বৈরাগী দিঘির পাড়ে কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমায় বিশাল রাসমেলা বসে। বাণেশ্বর শিব মন্দিরে শিবরাত্রীর দিনে মেলা হয়।

এক নজরে কোচবিহার

আয়তন : ৩৩৮৭ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ২১ লক্ষ ৭১ হাজার (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৬৪১/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ১.৬৭ শতাংশ
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৭৬.০৫ শতাংশ
কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৯৯.৭৭ শতাংশ
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ১১১৮টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ৭টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ: ৭০.৫৬ (১৯৯১)
সাক্ষরতা : ৪৫.৭৮ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য (পি. ডব্লু. রাস্তা) : ৬৬২ কিলোমিটার
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য (পি. ডব্লু. রাস্তা) : ৩৬৬ কিলোমিটার
মহকুমার সংখ্যা : ৫ (১৯৯৬) কোচবিহার সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা ও মেখলিগঞ্জ।
থানার সংখ্যা : ১০ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা* ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Coochbehar, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

জলপাইগুড়ি



জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। ১৮৫৪ সালে এই জেলার প্রথম আত্মপ্রকাশ রংপুর জেলার একটি মহকুমা হিসাবে। জেলা হিসাবে মর্যাদা লাভের পর জলপাইগুড়ি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯৪৭ সালে, ৪ মার্চ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই জেলার উত্তরে দার্জিলিং ও ভুটান, পূর্বে অসম, দক্ষিণে কোচবিহার ও বাংলাদেশ (রংপুর জেলা) এবং পশ্চিমে দার্জিলিং ও বাংলাদেশ। জলপাইগুড়ি শহর, থানা, মহকুমা, জেলা ও বিভাগের যৌথ শাসনকেন্দ্র।

জলপাইগুড়ি জেলা ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে কিছুটা সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকার আর কিছুটা দক্ষিণ হিমালয়ের পার্বত্যভূমির অংশ। বক্সা এবং ভুটান সীমান্তের নীকটবর্তী অঞ্চল ছাড়া জেলার বাকি অংশ নদীবাহিত উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। বক্সা সীমান্তে ডলোমাইটের খনি আছে। এর মজুত ভাণ্ডার প্রায় ৩০০ লক্ষ টন। এই ডলোমাইট দুর্গাপুর ইস্পাত তৈরির কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এই জেলার দক্ষিণের সমভূমি উত্তরে ক্রমশ উঁচু হতে হতে প্রায় ২০০০ মিটার ছাড়িয়ে গেছে। আরও উত্তরে উচ্চতা আরও বেশি।

এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পার্বত্য নদীগুলি সবই দক্ষিণমুখী। এদের মধ্যে মহানন্দা, তিস্তা, তোরসা, কালজানি, রায়ডাক, সঙ্কোশ, জলঢাকা ইত্যাদি প্রধান। তিস্তা উত্তর সিকিমের (৬৪০০ মিটার উচ্চতায়) হিমবাহ থেকে জন্ম নেওয়ার ফলে বরফ গলা জলে পুষ্ট, সারা বছরই এতে জল থাকে। নদীটি সমভূমিতে প্রবেশ করেছে সেবকের কাছ থেকে। তোরসার জন্ম দক্ষিণ তিব্বতের চুম্বি উপত্যকায় (৭০৬০ মিটার উচ্চতায়)। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ১৪৪ কিলোমিটার পথ পরিক্রমার পর বাংলাদেশের রংপুর জেলায় নাগেশ্বরীর কাছে তোরসা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। কালজানি কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি আর সঙ্কোশ অসমের সঙ্গে এই জেলার তথা পশ্চিমবঙ্গের

সীমানা তৈরি করেছে। নদীগুলিতে প্রায়ই বন্যা হয়। তিস্তার বন্যা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তাই একে বলা হয় ত্রাসের নদী। ত্রিস্রোতার সংক্ষিপ্ত রূপ তিস্তা। কেউ কেউ মনে করেন বোডো শব্দ 'টি' বা 'ডি' (যার অর্থ জল) থেকে তিস্তা নামের উৎপত্তি। পাহাড়ে পরিচিত রংতু নামে। লেপচা ভাষায় এর অর্থ সোজা নদী। এই জেলার ডায়না একমাত্র নদী যার উপর টোল ব্রিজ আছে। এই ব্রিজ গাড়ি করে পার হতে গেলে পয়সা লাগে। নদীটি ভুটানের ৬২৪০ ফুট উচ্চতায় উৎপন্ন হয়ে জেলার মধ্যে নাথুয়ার কাছে জলঢাকা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

রাজ্যের মধ্যে এই জেলা সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত অঞ্চল। এখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১৩৬ মিলিমিটার। জুলাই মাসে বৃষ্টি হয় সর্বাধিক। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এখানে আবহাওয়া আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে, যা এই অঞ্চলে পৃথিবীর বিরলতম গাছপালা জন্মাতে সাহায্য করেছে। এই গাছপালা আর্দ্র ক্রান্তীয় অরণ্য শ্রেণিভুক্ত। জেলার প্রধান গাছ শাল, শিশু ও গামার। এ ছাড়া চাপ, বহেরা, খয়ের, শিরীষ, শিমুল, কাটুস, চিলোনি, ওদাল ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। গাছপালার মতো এখানকার প্রাণীকুলও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনটি অভয়ারণ্য রয়েছে এই জেলায়: জলদাপাড়া অভয়ারণ্য আলিপুরদুয়ার মহকুমার মধ্যে, কাছাকাছি স্টেশন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের হাসিমারা। চালসা স্টেশনের কাছে গরুমারা ও চাপরামারি অভয়ারণ্য অবস্থিত। আর আছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। এই অভয়ারণ্যগুলিতে গন্ডার, হাতি, গউর (ভারতীয় বাইসন), বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক, বাঁদর, নানা রকমের সরিসৃপ, হরিণ এবং অনেক রকমের পাখির বসবাস। এই অঞ্চলের নদীগুলিতে প্রায় ১২৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই জেলাটির প্রাচীন ইতিহাস কখনো অসমের, কখনো কোচবিহারের, কখনো রংপুর জেলার অংশ হিসাবে



জলদাপাড়ার গন্ডার

বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত কিরাত জাতির রাজা ভগদত্ত পশ্চিম অসম বা প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন। কিরাত (তিব্বতি-মঙ্গোলীয়) জাতির লোকরা ছিল তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতের সভাপর্বে এদের বলা হয়েছে ম্লেচ্ছ, বর্বর। এদের আজও খুঁজে পাওয়া যায় তিব্বতি-বর্মি-বোড়ো গোষ্ঠীর মেচ, খ্যেন, কোচ, রাভাদের মধ্যে, যারা ছড়িয়ে রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ) জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায়। এরা কোথা থেকে এসেছিল তা নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। তবে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে এরা প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে।

চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে কামরূপ বলতে বোঝাত (সপ্তম শতাব্দীতে) সমগ্র অসম উপত্যকা এবং পশ্চিমে করতোয়া নদী পর্যন্ত এক বিস্তৃত অঞ্চল। এই রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ নিয়েই বলা যায় আজকের জলপাইগুড়ি জেলা।

এই জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত (জহুরি তালমা এলাকা, ময়নাগুড়ি অঞ্চল ও চিলাপাতা অরণ্য) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা একমত হয়েছেন যে, এই অঞ্চল প্রথমে গুপ্ত ও পরে পাল ও সেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি এই অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিলেন তিব্বতে যাওয়ার পথ খুঁজে বার করার জন্য। এই অভিযানের কাহিনী 'তবাকত-ই-নাসিরি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে এই অঞ্চলে কোচ, মেচ ও থারু জনগোষ্ঠীর মানুষরা বাস করত। এই অঞ্চল ছিল কামরূপ অধিপতির সাম্রাজ্যভুক্ত। এখানকার এক মেচ দলপতিকে, যে পরবর্তীকালে 'আলি মেচ' নামে পরিচিত হয়, মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়; সে-ই খলজিবাহিনীকে কামরূপ পৌঁছোতে সাহায্য করে।

পরবর্তীকালে বর্তমান জলপাইগুড়ির ভ্রূণ তৈরি হয় বৈকুণ্ঠপুর বলে একটি স্থানকে কেন্দ্র করে। এই বৈকুণ্ঠপুর কম-বেশি এখনকার সদর মহকুমা জলপাইগুড়িকে বোঝায়। এটি ছিল কামতাপুর-কামরূপ বা কোচবিহাররাজ বিশ্বসিংহের রাজ্যভুক্ত এলাকা। তিনি এই এলাকার সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর ভাই শিশু বা শিষ্যসিংহ বা শিবসিংহের হাতে। এই দায়িত্বের সঙ্গে অর্পিত হয় 'রায়কত' উপাধি। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে গৃহবিবাদ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও মুঘল আক্রমণে খণ্ডিত, দুর্বল ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে কোচবিহার রাজশক্তি; কোচবিহার থেকে এই অবসরে ধীরে ধীরে বৈকুণ্ঠপুর আলাদা হয়ে যায়। ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে চতুর্দশ রায়কত ভুপদেবের মৃত্যুর পর রংপুরের ফৌজদার সওকত জঙ্ সুযোগ বুঝে বৈকুণ্ঠপুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ভুপদেবের দুই নাবালক ছেলেকে বন্দি করে রংপুরে নিয়ে যায়। এইসময় বৈকুণ্ঠপুর রংপুর ফৌজদারের অধীনে পরগনা বলে ঘোষিত হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার শর্তসাপেক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বৈকুণ্ঠপুর দখল করে একে সাধারণ জমিদারিতে রূপান্তরিত করে।

জেলার প্রধান কৃষি ফসল ধান। অন্যান্য প্রধান কৃষি উৎপাদনের মধ্যে পাট, তামাক, সরষে, আখ ও গম উল্লেখযোগ্য। দলগাঁও ও ফালাকাটার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধান ও সরষে চাষের সর্ববৃহৎ অঞ্চল রয়েছে। জেলায় আনারস ও কলার চাষ হয়। চা জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গাজোলডোবায় প্রথম চা-বাগান স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই জেলায় দেড়শোর উপর চা-বাগান আছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের চা



জল্পেশ্বরের মন্দির

উৎপাদনকারী এলাকার চারভাগের তিনভাগই জলপাইগুড়ি জেলায়। ৮০ শতাংশ চা-শ্রমিকই আদিবাসী (সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাঁও ইত্যাদি)। প্রচুর পরিমাণে চা বিদেশে রপ্তানি হয়।

জেলার মধ্যে রাজ্য সড়ক ও ভালো পাকা রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে যুক্ত করেছে। কামতাপুর-কামরূপরাজ নীলাম্বর তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে রাজধানীকে যুক্ত করতে বেশ কয়েকটি রাস্তা বানিয়েছিলেন। এরকম একটি রাস্তা জল্পেশ্বর মন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটি এখন দিনহাটা-মেখলিগঞ্জ সড়ক নামে পরিচিত। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ইত্যাদি জায়গার সঙ্গে জলপাইগুড়ি যুক্ত হয়েছে রাজ্য সড়ক দ্বারা। জেলাটি ৩১নং জাতীয় সড়ক দ্বারা যুক্ত রয়েছে দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, কলকাতা, গৌহাটি ইত্যাদির মতো ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির সঙ্গে। জেলায় উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগমের অনেকগুলি বাস চলাচল করে। জেলার মধ্য দিয়ে ব্রডগেজ ও মিটার গেজ লাইনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের ট্রেনে চড়ে জেলার বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও অসম পর্যন্ত যাওয়া যায়।

জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষাই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা। বেশিরভাগ রাজবংশী ও মেচরা তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা বলে দাবি করেন। এরপর কুরুখ-ওঁরাওভাষীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই জেলার মাদারিহাট থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে টোটোপাড়ায় বাস করেন পৃথিবীর অন্যতম বিরল জনগোষ্ঠীর মানুষ টোটোরা। বর্তমানে এঁদের সংখ্যা এক হাজারেরও কম। তিব্বতি-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর কোনো ভাষায় এরা কথা বলেন। এরা মোঙ্গল জনগোষ্ঠীর একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। বাইরের জগতের কাছে এদের পরিচয় প্রথম তুলে ধরেন ড. চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর লেখা বইয়ের মাধ্যমে (*The Meches*

and the Totos of North Bengal, North Bengal University, 1973)।

তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত জলপাইগুড়ি শহরটিকে করলা নদী দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এখান থেকে বরফ ঢাকা হিমালয়ের কোনো কোনো শৃঙ্গ চোখে পড়ে। এই শহরে কয়েকটি কালীমন্দির দেখা যায়। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার অন্তর্বর্তী মন্থনীগ্রামের মন্থনীদেবী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লৌকিক কাহিনী অনুসারে দেবীচৌধুরানি নামে এক নারী ডাকাত দ্বারা এই দেবী পূজিতা হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবীচৌধুরানী' উপন্যাসটি এই নারী ডাকাতের চরিত্র ঘিরেই রচিত। এই উপন্যাসের আর একটি চরিত্র ভবানী পাঠক অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। এই বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের গোপন আস্তানা ছিল বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল।

ময়নাগুড়ি থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে জর্দা নদীর ধারে প্রাচীন জল্পেশ মন্দির। এই মন্দিরের স্থাপত্যকলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় শৈলির ছাপ বর্তমান। এটি একটি শিব মন্দির। পাল-সেন যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন আছে এই মন্দিরে। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের হাতে মন্দিরটির সংস্কার হয়। তখনই মসজিদের ভাব ফোটানো হয় মন্দিরের বাইরের চেহারায়। শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রতি বছর এখানে খুব বড়ো মেলা হয়। আলিপুরদুয়ার মহকুমায় জয়ন্তিতে জঙ্গল ঘেরা পাহাড় চূড়ায় গুহার মধ্যে মহাকালের মন্দির আছে। মধ্যযুগে তান্ত্রিক শৈবধর্মের প্রভাবে মহাকাল শিবের ধারণা গড়ে উঠেছিল। এই দেবতা জেলার কোচ, মেচ রাজবংশীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়।

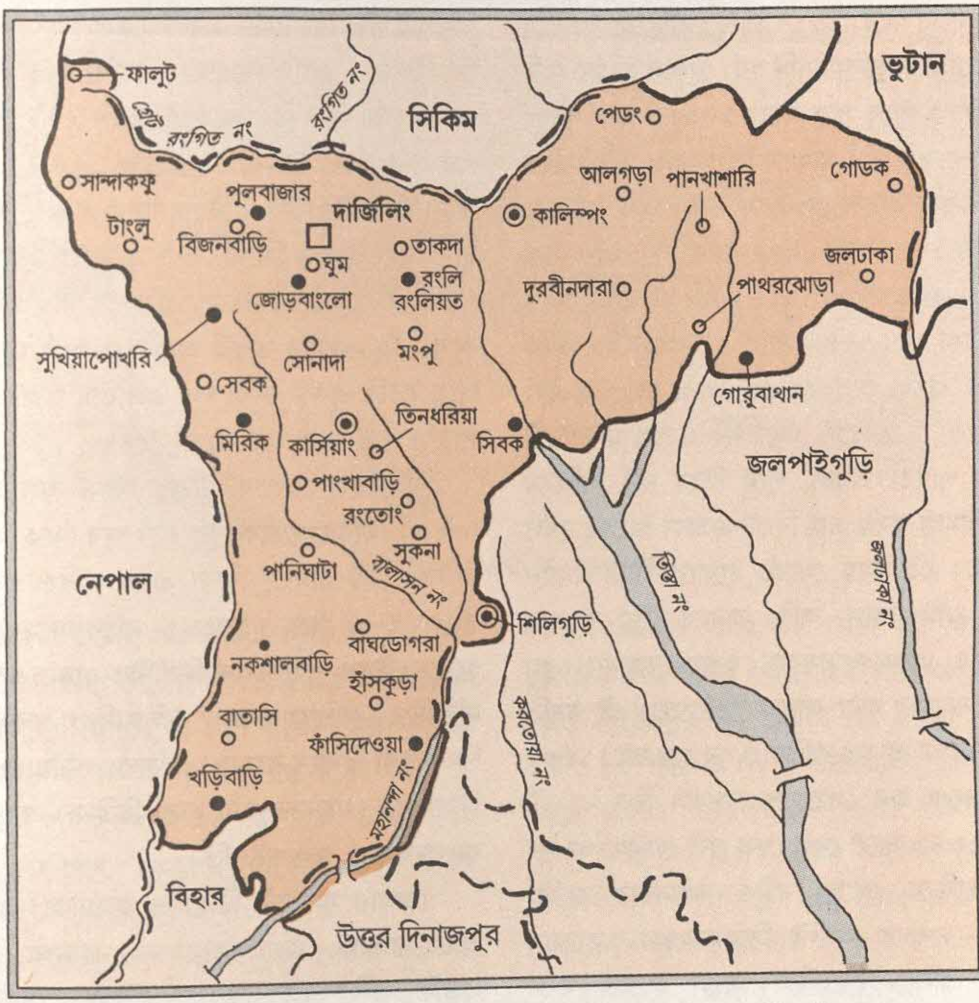
বখতিয়ার খলজির আমলে এখানে মুসলমান ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। জেলায় এই ধর্মের চেহারা পির-মুরশেদের আরাধনার মধ্যে অনেকখানি সীমাবদ্ধ। জলপাইগুড়ি শহরে জেলার প্রথম মসজিদ ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয়।

এক নজরে জলপাইগুড়ি

আয়তন : ৬২২৭ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ২৮ লক্ষ ১ হাজার (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৪৫০/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ২৯.০৫ শতাংশ (পাঁচ বছরের গড় ১৯৮২-৮৩ থেকে ৮৬-৮৭)
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৪৭.১৭ শতাংশ (পাঁচ বছরের গড় ১৯৮২-৮৩ থেকে ৮৬-৮৭)
কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৯৯.৪১ শতাংশ (পাঁচ বছরের গড় ১৯৮২-৮৩ থেকে ৮৬-৮৭)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ: ৪৩.১৭ (১৯৯১)
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ৭২৫টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ১২টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
সাক্ষরতা : ৪৫.০৯ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি)
হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ১৯৭
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য (পি. ডব্লু. রাস্তা) : ১২৭২ কিলোমিটার (৩১ মার্চ, ১৯৯৪)
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য (পি. ডব্লু. রাস্তা) : ১১ কিলোমিটার (৩১ মার্চ, ১৯৯৪)
মহকুমার সংখ্যা : ২ (১৯৯৬) জলপাইগুড়ি সদর, আলিপুরদুয়ার
থানার সংখ্যা : ১৬ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Jalpaiguri, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

দার্জিলিং



তিব্বতি শব্দ 'দোর্জে-লিং' থেকে দার্জিলিং নামের উৎপত্তি। ওই ভাষায় 'দোর্জে' অর্থ বজ্র এবং 'লিং' অর্থ স্থান। অর্থাৎ দোর্জেলিং বা দার্জিলিঙের অর্থ হল বজ্রের দেশ। ত্রিপিটকাচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন দার্জিলিঙের ভাষান্তর করেছেন 'বজ্র-দ্বীপ'।

এই জেলার সুসংহত প্রাচীন ইতিহাস কিছু নেই। ইংরেজ আগমনের পূর্বে জেলাটি স্বাধীন রাজ্য সিকিমের অধীনে ছিল। তিব্বতিরা তখন বলত 'ডিজং' অর্থাৎ 'ধানের দেশ'। লেপচারা ছিল সিকিমের আদিম অধিবাসী। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেপচাদের পরাভূত করে সিকিম দখল করে তিব্বতিরা। সেই সময় এখানে বৌদ্ধ লামা ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। জেলার বৌদ্ধ মঠগুলি এই ধর্মের প্রভাবের সাক্ষ্য এখনও বহন করছে। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজা সিকিমের সঙ্গে তিরিশ বছর ধরে এক দীর্ঘ যুদ্ধ চালায়। এই যুদ্ধে সিকিমরাজ পরাজিত হলে মেচি নদী থেকে তিস্তার পশ্চিম পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত মোরাং বা তরাই অঞ্চল

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে নেপালরাজের অধীনে আসে। ইংরেজবাহিনী নেপাল আক্রমণ করে নেপালের এই অগ্রগমন রোধ করে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে নেপালরাজের তেঁতুলিয়া সন্ধি হয়। নেপাল আবার মেচি নদীর পশ্চিম পারে সরে যায়। ১৮৩৫ সালে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত এক দলিলের মাধ্যমে সিকিমরাজ দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চল ইংরেজকে দিয়ে দেয়। এর বিনিময়ে সিকিমরাজ ১৮৪১ সাল থেকে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা করে ভাতা পেতে থাকে। ১৮৪৬ সালে ওই ভাতা বেড়ে ৬০০০ টাকা হয়। ১৮৪৯ সালে কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করে রাখার অপরাধে ওই ভাতা বন্ধ হয় এবং তরাই অঞ্চল, উত্তরে গ্রেট রঙ্গিত নদী ও রাম্মাম মধ্যবর্তী সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল, পূর্বে তিস্তা নদী, পশ্চিমে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত এক বিরাট এলাকা ইংরেজ দখল করে নেয়। এই সময় থেকেই ইয়োরোপীয়রা এখানে অনেকে জমি কিনে বাড়ি বানাতে শুরু করেন। বাঙালিরাও অনেকে বসবাস করতে আসেন। রুগ্ন ইংরেজ সৈন্যদের জন্য ব্যারাক তৈরি হয়। এই বসতি ঘিরে নানারকম ব্যাবসা-বাণিজ্যও শুরু হয়ে যায়। ১৮৩৯ সালে একশো জন লোকেরও বসবাস ছিল না এই অঞ্চলে, ১৮৪৯ সালে দেখা গেল সেই লোকসংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। যদিও এখানকার আদিম অধিবাসী লেপচারা আগেই সিকিমরাজের অত্যাচারে নেপালে পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে ইংরেজ যখন দার্জিলিং দখল করে দার্জিলিং প্রায় জনশূন্য। কালিম্পং মহকুমার সুরুক মৌজায় এখনও কয়েকটি লেপচা পরিবার দেখা যায়। তিস্তার পূর্বপারের এই কালিম্পং ১৮৬৫ সালে দার্জিলিঙের সঙ্গে যুক্ত হলে দার্জিলিং জেলা বর্তমান আকার লাভ করে।

১৯০৫ সালে এই জেলাটি অবিভক্ত বঙ্গের রাজশাহি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১২ সালে জেলাটি আবার রাজশাহি বিভাগে ফিরে আসে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের আওতাধীন হয়। এখন এটি জলপাইগুড়ি বিভাগের একটি জেলা।

উত্তর দার্জিলিঙের বেশিরভাগ অংশ পার্বত্যভূমি, যা হিমালয়েরই অংশ। এই জেলার পাহাড়-পর্বত তৈরি হয়েছিল এখন থেকে আনুমানিক ৩০ বা ৪০ লক্ষ বছর আগে টার্সিয়ারি যুগে। দার্জিলিং-নাইস নামক শিলা পাহাড়ি অঞ্চলের গঠনপ্রণালীকে এবং নদীনালার চলার পথকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই জেলার তরাই অঞ্চল না-পলি-না-পাথর দিয়ে তৈরি একটা নিরপেক্ষ এলাকা। তরাই একটি পারসি শব্দ, যার অর্থ স্যাঁতসেঁতে।

দার্জিলিং জেলার উত্তর সীমা ফালুট শৃঙ্গ (৩৬০০ মিটার) থেকে শুরু হয়ে পূর্ব দিকে রাম্মাম, রঙ্গিত, গ্রেট রঙ্গিত, তিস্তা এবং আরও পূর্বদিকে রংপো চু ও পরে রুসেতা চু নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমানা নির্ধারিত হয়েছে জলঢাকা নদী দিয়ে। পশ্চিমে নেপাল (সিঙ্গালিলা পর্বত শৈল বিভাজিকা হিসাবে রয়েছে), দক্ষিণে পুর্নিয়া ও উত্তর দিনাজপুর (মহানন্দা নদী দ্বারা চিহ্নিত) এবং পূর্বে বাংলাদেশ ও জলপাইগুড়ি।

জেলার মূল নদী তিস্তা ও জলঢাকা। এ ছাড়া আছে রাম্মাম, মেচি, বালাসন, মহানন্দা, রঙ্গিত প্রভৃতি নদী। এই জেলায় তিস্তার দৈর্ঘ্য ৩৭ কিলোমিটার, জলঢাকার ১৯.৪৭ কিলোমিটার, বালাসনের ৪৮.৪০ কিলোমিটার, মহানদীর (মহানন্দা) ৯১.৭০ কিলোমিটার, মেচির ৬৩.২১ কিলোমিটার, রাম্মামের ৩৯.৭৮ কিলোমিটার। রায়তাল ও মিরিক উল্লেখযোগ্য দুটি হ্রদ। নদী, ঝরনা, ঝোরা, হ্রদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও চাষের জন্য সেচের জল পাওয়া খুব কঠিন। ফলে দার্জিলিং জেলা কৃষিতে পশ্চাদপদ। দার্জিলিং শহরে প্রচণ্ড জলাভাব। সিঞ্চল হ্রদ থেকে গত ষাট বছরে এই



তিস্তা ব্রিজ (স্থানীয় নাম বাঘপুল)

শহরের জন্য জলের সরবরাহ একটুও বাড়েনি। এই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ উদ্যোগ নিয়েছে। এই সমস্যার সমাধান না হলে দার্জিলিঙের অন্যতম প্রধান শিল্প পর্যটন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। খরস্রোতা নদীর জল ব্যবহার করে এই জেলাতেই ভারতবর্ষের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিদ্রাবঙ্) স্থাপিত হয় নভেম্বর ১০,১৮৯৭ তারিখে।

এই জেলার মতো বনাঞ্চলের বৈচিত্র খুব কম জেলাতেই পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া যায় চাঁপ, পিটালি, ওক, চিকরাসি, বহেড়া, শিশু, শিরীষ ইত্যাদি গাছ। ৩০০০ মিটার থেকে বেশি উচ্চতায় পাওয়া যায় রডোডেনড্রনের ঝোপ ও গাছ যার সঙ্গে মিশে আছে নানান ধরনের বাঁশ, হেমলক ও ওক। রঙ্গিত নদীর উপত্যকায় কিছু পাইনের জঙ্গল দেখা যায়। পাইন ও ওক গাছের জঙ্গল কেটে বহু বছর আগে চা-গাছ বোনা হয়েছিল। এ ছাড়া চা-বাগানের বিপুল পরিমাণ জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটানো হয় বন থেকেই। ১৮৭৪ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত শুধু রেলকোম্পানির প্রয়োজন মেটাতেই গাছ কাটা হয়েছে ৩ লক্ষ টনের বেশি। এই ক্ষতি কখনো পূরণ হয়নি পুরোপুরি, যা হয়েছে তা ৫-১০ শতাংশ। অর্থাৎ ৯০ শতাংশ অরণ্য চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। ১৯১১ সালে এই জেলার ৪৫ শতাংশ অঞ্চল অরণ্য আচ্ছাদিত ছিল। ১৯৯৪ সালে সেই পরিমাণ ১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে আজ জেলার যেখানে-সেখানে প্রায়ই ধস নামতে দেখা যায়।

দার্জিলিং জেলার অর্থনীতিতে চা-বাগানের প্রভাব অনেকখানি। সুগন্ধি দার্জিলিং চা পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু চা-বাগানের সংখ্যা আজ কমে যাচ্ছে। ১৯৫০ সালে পার্বত্য অঞ্চলে ১০১টি বাগান ছিল। এখন সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭২টিতে। এলাচি, কমলালেবু এবং আদা পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কৃষিজ পণ্য। ভুট্টা এখানকার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃষি ফসল। মাত্র ১৪ শতাংশ কৃষিজমি 'চালের' উৎপাদনে (ধান চাষে) ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ের ঢালে ধাপ করে চাষ করা হয়। এই জেলার মংপুতে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিঙ্কোনা চাষের একটি কেন্দ্র আছে। ওষধি গাছের মধ্যে ইপিকাক, সর্পগন্ধা, ডিজিটালিস গুরুত্বপূর্ণ।

শিলিগুড়ি শহর থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে মাটিগাড়ার কাছে হিমুলের (*Himul—the Himalayan Co-Operative Milk Producers' Union Ltd.*, স্থাপিত ১৯৭৩) দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে এই দুধ সরবরাহ করা হয়।

৫৫নং জাতীয় সড়ক ধরে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়া যায়। ৩১নং জাতীয় সড়ক সিবক থেকে গ্যাংটক চলে গেছে। রেলপথ পরিবহন এই জেলায় যথেষ্ট উন্নত নয়। পর্যটকদের কাছে জেলার টয় ট্রেনে ভ্রমণ খুবই মজার।

এই জেলায় পর্যটন একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। পর্যটকদের কাছে দার্জিলিং এখনও পাহাড়ের রানি। দার্জিলিঙের উচ্চতম স্থান সান্দাকফু (উচ্চতা ৩৬৩০ মিটার) থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য খুবই মনোরম। মার্চ-এপ্রিল মাসে সান্দাকফুর পথে চোখে পড়ে ফুটে থাকা গুচ্ছ গুচ্ছ রডোডেনড্রন ফুল। কার্সিয়াং মহকুমায় মিরিক নামে বিশেষ পর্যটন কেন্দ্র একটি কৃত্রিম হ্রদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। অনেকে একে দ্বিতীয় কাশ্মীর বলে। উদ্ভিদ প্রেমিকরা কার্সিয়াংকে বলে 'ল্যান্ড অফ হোয়াইট অর্কিড'।

দার্জিলিঙে নেপালি, তিব্বতি, ভুটিয়া, কোচ, রাজবংশী, মুন্ডা, ওরাঁও, মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। তাই দার্জিলিংকে বলে 'Babel of tribes and nations'। এর প্রভাব পড়েছে জেলার ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। ফলে দার্জিলিং কোনো এক নির্দিষ্ট ভাষাভাষী এলাকা হয়ে উঠতে পারেনি। পাহাড় অঞ্চলে চলিত বা কথ্য ভাষা হল নেপালি বা গোর্খালি। পাহাড়তলি অঞ্চলে এর সঙ্গে হিন্দির মিশ্রণ ঘটেছে এবং সমতল ভূমিতে রাজবংশী উপভাষা। একমাত্র লেপচারাই তাদের মাতৃভাষা রং-রিং আজও পরিত্যাগ করেনি। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে এই ভাষাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা।



বাতাসিয়া লুপ ও টয় ট্রেন

জেলার স্থান নামে লেপচা, তিব্বতি ভাষাসংস্কৃতির প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। মিরিক (পোড়াপাহাড়), ফালুট (জঙ্গলহীন পর্বতশৃঙ্গ), সিবক বা সুবক (যেখানে ঠান্ডা বাতাস বয়) প্রভৃতি লেপচা শব্দ। কাঞ্চনজঙ্ঘা (বরফের পাঁচটি বিরাট ভাণ্ডার), নকশাল (শিকারের বনভূমি) প্রভৃতি তিব্বতি শব্দ।

তরাই অঞ্চলে রাজবংশীদের রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাহিনী ভিত্তিক নটুয়া পালা, পাহাড়ে নেপালিদের দশৈ, তিহার প্রভৃতি উৎসব উল্লেখযোগ্য। লোকশিল্পের নিদর্শন হিসেবে জেলার চারু ও কারু শিল্পের উল্লেখযোগ্য জিনিস তৈরি হয় বিভিন্ন জায়গায়। যেমন মাটিগাড়া, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি প্রভৃতি জায়গায় তাঁতে বোনা পাটের আঁশ থেকে তৈরি ধোকড়া শিল্পের বিছানার চাদর, বসবার আসন বিখ্যাত; বাগডোগরা, দেবীগঞ্জ, হিলকার্ট রোডের আশেপাশে তৈরি হয় বেতের আসবাবপত্র, তিব্বতি-ভুটানিরা তৈরি করেন মুখোশ। আসলে বেত দার্জিলিঙের একটি বিশিষ্ট বনজ সম্পদ। স্থাননামেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। লেপচা ভাষায় কার্সিয়াং-এর অর্থ হল বেতের লাঠি।

দার্জিলিং শহরের 'অবজার্ভেটরি' পাহাড়ে মহাকালের মন্দিরে একই সঙ্গে মহাদেব ও বুদ্ধদেবের পূজা হয়। পাশাপাশি বসে থাকেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও বৌদ্ধ লামা। দার্জিলিং শহরের আশেপাশে আরও কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ আছে।

কবি-সাহিত্যিকদের বারবার টেনেছে শৈলশহর দার্জিলিং। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন এই শহরে এসেছিলেন ১৮৯৩ সালে। নোবেলজয়ী বাঙালি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার্সিয়াং, কালিম্পং, মংপু, তিনধরিয়াতে বহুবার এসেছেন, থেকেছেন, কবিতা লিখেছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'দার্জিলিঙের চিঠি' কবিতায় এই শহর নিয়ে রোমাঞ্চকর আবেগ ফুটিয়েছেন :

"বন্ধু, আমি একা বসে আছি সাতশো তলার ঘরে।
বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় করে।"

এক নজরে দার্জিলিং

আয়তন : ৩১৪৯ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ১৩ লক্ষ (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৪১৩/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ৩৮.৯১ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৭৪.৬১ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কর্ষিত জমি (চাষযোগ্য জমির) : ৯৯.৭৩ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৫৪.০০ (১৯৯১)
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ৫১০টি (৩১.৩.৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ৭টি (৩১.৩.৯৪)
সাক্ষরতা : ৫৭.৯৫ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি)
হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ১২৩ (৩১.৩.৯৪)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য (পি. ডব্লু. রাস্তা) : ৫২৭ কিলোমিটার
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য (পি. ডব্লু. রাস্তা) : ৪ কিলোমিটার
মহকুমার সংখ্যা : ৪ (১৯৯৬) দার্জিলিং সদর, কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং শিলিগুড়ি
থানার সংখ্যা : ১৬ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Darjeeling 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

নদীয়া



নদীয়া নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের কতগুলি ঘটনা সার বেঁধে স্মৃতিপটে এসে ভিড় করে। সে ঘটনাবলির মধ্যে বাঙালির লজ্জা ও গৌরব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। এইখানেই বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি একহাতে কোরান অন্যহাতে অসি নিয়ে নদীয়া জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমান যুগের সূচনা করেছিলেন। ভবানন্দ মজুমদারের (ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যে উল্লিখিত নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইখানে রাজত্ব করতেন। এইখানেই পলাশির প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন সূর্য অস্ত গিয়েছিল ইংরেজের হাতে ১৭৫৭ সালে। এখানেই কৃষক বিদ্রোহের নায়ক তিতুমির গর্জে উঠেছিল ১৮৩১ সালে ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এইখানেই ১৮৬০ সালে

নীলবিদ্রোহ মাথা তুলেছিল নীলকর সাহেবদের শোষণের ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে। এইখানেই ভক্তি আন্দোলনের নায়ক চৈতন্যদেব সব ধর্মের গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করে ভাসিয়ে দিয়েছিল জাতপাত, ধর্মাধর্মের ভেদাভেদ।

এই অতীতের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আজকের নদীয়া। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮২) মৃত্যুর পর ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঘোষিত বাংলার প্রথম জেলা নদীয়া। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়া যশোহর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইসময় কৃষ্ণনগরকে সদর করে নদীয়া বিভাগ গঠিত হয়। ১৮৬০ সালে কৃষ্ণনগর থেকে সদর সরিয়ে নেওয়া হয় আলিপুরে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় নদীয়ার নাম নবদ্বীপ (জেলা) রাখা হয়। পরে তা বদলে পূর্বনাম নদীয়া করা হয়। নবদ্বীপের অর্থ নব উদ্ভূত দ্বীপ।

জেলাটি মূলত পলিগঠিত সমতলভূমি। নদীয়া পরিণত ব-দ্বীপের অংশ। জলঙ্গী ও চূর্ণীকে বলা হয় নদীয়ার নদী। এদের পথ সর্পিল এবং জায়গায় জায়গায় অনেক বিল তৈরি করেছে। ক্রমাগত পলি পড়ে এবং পানাকচুড়িতে মজে গিয়ে নদীগুলির প্রবাহপথ অবরুদ্ধ। বর্ষায় তাই এখানে অনেক জায়গায় বন্যা হয়। এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল ভাগীরথী, ভৈরব ও মাথাভাঙা। এই জেলায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর মাটির অল্প নীচেই পাওয়া যায়। কর্কটক্রান্তি রেখা জেলার মাঝামাঝি দিয়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হয়। নদীয়ার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে ২৪-পরগনা, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলি, পূর্বে বাংলাদেশ। নদীয়া প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা।

নদীয়া জেলা গোপাল (রাজত্বকাল ৭৫০-৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ) ও ধর্মপালের (রাজত্বকাল ৭৭৫-৮১০ খ্রিস্টাব্দ) শাসনাধিকারে ছিল। পাল রাজত্ব শেষ হয়ে সেন রাজত্ব শুরু হয় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে। সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৪ খ্রিস্টাব্দ—রাজত্বকাল) নবদ্বীপ শহরের পত্তন করেন। লক্ষ্মণ সেন 'পরমবৈষ্ণব' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এঁর সভাকবি ছিলেন 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেব। পঞ্চদশ শতকে সুলতানি আমলে ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন এবং চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) জন্ম হয়।

কুলজিশাস্ত্র অনুসারে নবম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর কনৌজ থেকে যে ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণকে এনেছিলেন তিনিই নদীয়ার রাজবংশের আদি পুরুষ। ভট্টনারায়ণের ২০তম বংশধর ভবানন্দ মজুমদার (রাজত্বকাল ১৬০৬-২৮ খ্রিস্টাব্দ) নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ভবানন্দ মজুমদার যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মুঘল সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁকে বাগওয়ালসহ চোদ্দোটি পরগনার অধীশ্বর করে দেন। মুঘল আমলে নদীয়া যশোহরের ফৌজদারের অধীনে থাকে। পরবর্তীকালে রাজধানী নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুরের কাছে রেউই গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। এইসময় রেউই গ্রামের নতুন নাম হয় কৃষ্ণনগর। নদীয়ার রাজারা 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁকে 'বাংলার বিক্রমাদিত্য' বলা হয়। কৃষ্ণচন্দ্র সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধে ক্লাইভের পক্ষ নিয়েছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে 'রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি দিয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে বাংলা, সংস্কৃত, ফারসিভাষা ভালো জানতেন। গুণীজন ও বিদ্বানের সমাদর করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।



কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা ভারতচন্দ্র কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রবাদ হয়ে ওঠা তার কাব্যের কিছু কিছু পংক্তি থেকে। আমরা আজও বলি : 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস', 'মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গ প্রহার করে', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন', 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে', 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী' ইত্যাদি।

জমিদার ও ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নদীয়ার বিদ্রোহী কৃষকদের ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তিতুমিরের নেতৃত্বে কৃষক অভ্যুত্থান (১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ) এবং নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০)। স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই জেলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অনন্তহরি মিত্র (১৯০৬-১৯২৬), বাঘাযতিন (১৮৭৯-১৯১৫) প্রমুখ শহীদরা এখানেই জন্মেছিলেন।

নদীয়া কৃষিপ্রধান জেলা। ধান উল্লেখযোগ্য প্রধান কৃষিফসল। এরপরেই পাটের স্থান। এ ছাড়া ডাল, তৈলবীজ এবং সবজি অন্যতম প্রধান ফসল। আখ, আলু ও বিভিন্ন মশলাও এই জেলায় চাষ হয়। নলকূপ ও খাল, বিল ও বাঁওড়-এর জলের সাহায্যে চাষের জমিতে সেচ দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকার পরিচালিত কল্যাণী স্পিনিং মিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারি অ্যান্ড পোলট্রি ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন লি. (কল্যাণী), হরিণঘাটা গভর্নমেন্ট ডেয়ারি ফ্যাক্টরি (হরিণঘাটা) ছাড়াও এই জেলায় কয়েকটি ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে। নদীয়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত বস্ত্রবয়ন শিল্প দীর্ঘদিনের। এখানকার মৃৎশিল্পের খ্যাতি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গেছে। নবদ্বীপ ও রানাঘাটের কাঁসার বাসনপত্রের খ্যাতি আছে। ১৮৫১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'এক্সিবিশন অব দি ওয়ার্কস অব ইন্ডাস্ট্রি অব অল নেশনস' প্রদর্শনীতে নদীয়ার মৃৎশিল্পী রাম

পাল পুরস্কৃত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এখানকার মৃৎশিল্পীরা আরও অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে আসেন। আমেরিকার পিয়াবডি মিউজিয়ামে কৃষ্ণনগরের কিছু মাটির কাজ আজও সংরক্ষিত আছে। জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী কৃষ্ণনগর পৌরশহরের পূর্ব-দক্ষিণ উপকণ্ঠে ঘূর্ণি, ষষ্ঠীতলা-কুমোরপাড়া এবং আনন্দময়ী-রথতলা নতুনবাজার অঞ্চলে এই মৃৎশিল্পীদের পুরুষানুক্রমিক সমাবেশ ঘটেছে। গঙ্গার তীরবর্তী শান্তিপুর ও ফুলিয়ায় বস্ত্রবয়ন শিল্পের কেন্দ্রিভবন ঘটেছে। ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ির জন্য বিখ্যাত। রামনগর, চাকদহ প্রভৃতি হাটে কাপড় কেনা-বেচা হয়।

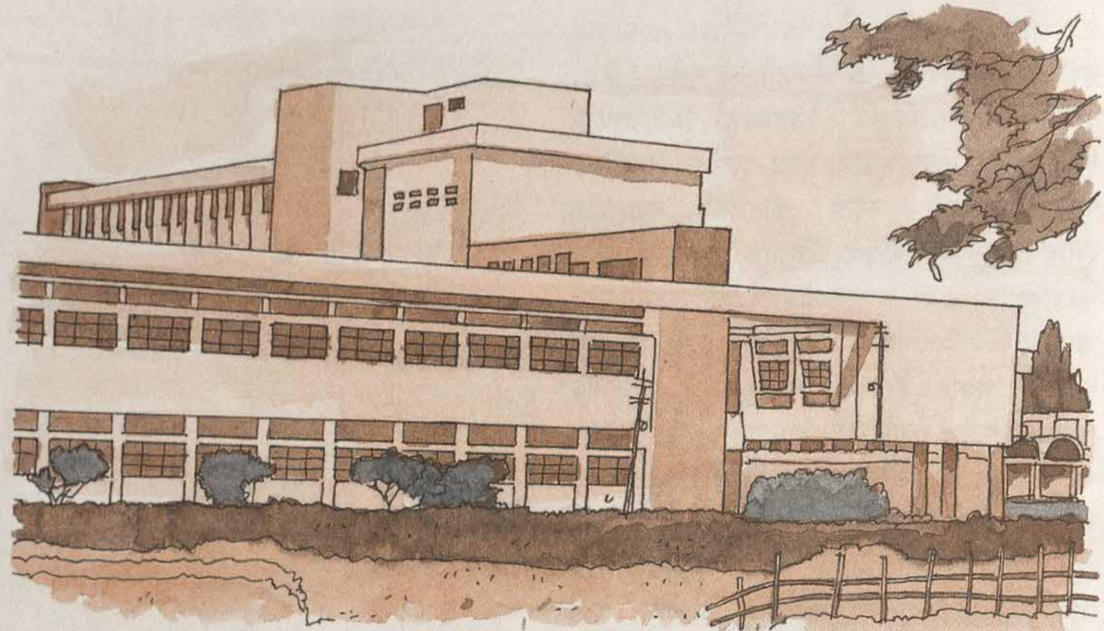
কলকাতা থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়ক জাগুলি, রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, পলাশি হয়ে প্রসারিত। কলকাতা থেকে এই জেলায় এবং এই জেলা থেকে কলকাতায় কয়েক হাজার লোক রেল ও সড়ক পথে চাকরি ও অন্যান্য কর্মসূত্রে প্রত্যহ যাতায়াত করে।

নদীয়া লোকসংস্কৃতি ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার পীঠস্থান। এখানে এই ধারার সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়েছে একদিকে ভারতচন্দ্র রায়, কৃত্তিবাস ওঝা, লালন ফকিরের হাতে, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত নতুনকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), যতীন্দ্রমোহন বাগচি (১৮৭৮-১৯৪৮), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), হেমচন্দ্র বাগচি, মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), 'গৌড়লেখমালার রচয়িতা' অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) প্রমুখ কৃতী সন্তানদের হাতে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) এক প্রবন্ধে ('কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা : অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলার একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র') নদীয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে :



পলাশি স্মৃতিস্তম্ভ

'কৃষ্ণনগর এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত, যাকে একই সঙ্গে বাঙলার হৃদয় ও মস্তিষ্ক বলা চলে। ...কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি অবস্থিত স্থানগুলি, যেমন নবদ্বীপ, উলা, বীরনগরের বাংলা সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক, জাগতিক বুদ্ধিবৃত্তির এবং মননের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। ...ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের


কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

পর কয়েকটি প্রজন্ম ধরে নদিয়ার শান্তিপুরের বাচনভঙ্গিকে বাংলাভাষার বাচন-সৌন্দর্যের মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। তার কারণ, এখানে বিকশিত হয়েছেন বহু প্রতিভাবান লেখক।' বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' অনুসারে হুসেন শাহের আমলে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী ও টোলগুলিতে লক্ষ লক্ষ ছাত্র পড়তেন। এই যুগের নবদ্বীপকে তাই বলা হয় বাংলার 'অক্সফোর্ড'।

এই শহরে শারদীয় দুর্গাপূজার চেয়েও বেশি জনপ্রিয় রাসপূর্ণিমায় রাস উৎসব হয়। বহুসংখ্যক কালীপূজা এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণনগর জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য বিখ্যাত। সংখ্যায় এখানকার জগদ্ধাত্রী পূজা চন্দননগরকেও ছাড়িয়ে যায়। বাদকুল্লা স্টেশনে নেমে পাটুলি গ্রামে যাওয়া যায়। এখানে অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় ডাকাতে কালীর পূজা হয়। এই পূজার বৈশিষ্ট্য হল সূর্যোদয় থেকে রাত পোহানোর আগে পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৭/১৮ হাত উঁচু দক্ষিণা কালীমূর্তি নির্মাণ, পূজা এবং বিসর্জন শেষ করে ফেলতে হয়। এর কাছেই আড়বন্দি গ্রামে ফাল্গুন মাসে ব্রহ্মাপূজা উপলক্ষে মেলা হয়, চলে সাত দিন। এটি একটি তিনশো বছরের প্রাচীন উৎসব। চৈত্রের শুক্লা একাদশীতে রাজবাড়ির চকের মাঠে অনুষ্ঠিত বারদোলের মেলাও খুব বিখ্যাত।

নদীয়া যে একটি পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ জেলা তার সাক্ষ্য বহন করছে এখানকার মন্দিরগুলি। চাকদহ থানার পালপাড়ার মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত। এমনকী পাহারার ব্যবস্থাও আছে। সব মন্দিরই পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণে সজ্জিত। মন্দিরগুলি বাংলার নিজস্ব মন্দির স্থাপত্যরীতির নমুনা হিসাবে খুবই মূল্যবান। এ ছাড়া নদীয়ার লোকসংস্কৃতির আঙিনায় রয়েছে বোলান গান। বোলান হল বালার গান। গাজন সন্ন্যাসীদের বলা হয় বালা। এখানকার জারিগান (জারি আরবি শব্দ। অর্থ হল জাহির করা) বিখ্যাত। মুসলমানদের মধ্যে মহরম উপলক্ষে জারি নৃত্যগীত

হয়। আখড়াই গানের (তরজা লড়াই ও কবি গান) জন্মস্থানও এই নদীয়া। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূলকেন্দ্র ঘোষপাড়ায় দোলপূর্ণিমায় বসে সতীমার মেলা। বাউল (সংস্কৃত বাতুল) মানে পাগল। হিন্দু-মুসলমান যে-কেউ বাউল হতে পারে। মুসলমান বাউলদের আউল (আরবি শব্দ, পাগল) বলা হয়। এদের মধ্যে লালন ফকিরের গান সর্বাধিক প্রচলিত।

কৃষ্ণনগর ছাড়িয়ে বেথুয়াডহরিতে আছে ০.৬৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকার একটি অভয়ারণ্য। এখানে শাল, অর্জুন, শিশু গাছের অরণ্যে আছে চিতল হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, সম্বর, বনবিড়াল, শিয়াল প্রভৃতি জন্তু।

এখানে দর্শনীয় জিনিসের মধ্যে অন্যতম হল মায়াপুরের ইসকন প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রোদয় মন্দিরটি। এই জেলায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা ১৯৬০) ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা ১৯৭৪) অবস্থিত।



শ্যামচাঁদ মন্দির, শান্তিপুর

এক নজরে নদীয়া

আয়তন : ৩৯২৭ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

জনসংখ্যা : ৩৮ লক্ষ ৫২ হাজার (১৯৯১)

জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৯৮১/বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

বনাঞ্চল (মোট জমির) : ০.৩৩ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

কৃষিযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৮১.২০ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

কর্ষিত জমি (মোট কৃষিযোগ্য জমির) : ৯৯.৩১ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৫৫.৭৯ (১৯৯১)

বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ১২৫৪টি (৩১.৩.৯৪)

বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ১৬টি (৩১.৩.৯৪)

সাক্ষরতা : ৫২.৫৩ শতাংশ (১৯৯১ আদমসুমারি)

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ১৮৫টি (৩১.৩.৯৪)

জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য : ১২৭ কিলোমিটার

পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য (পি. ডব্লু. রাস্তা) : ৯৩৬ কিলোমিটার (৩১.৩.৯৪)

কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য (পি. ডব্লু. রাস্তা) : ৩৮ কিলোমিটার (৩১.৩.৯৪)

মহকুমা সংখ্যা : ৪টি (১৯৯৬), কৃষ্ণনগর সদর,, তেহট্ট, রাণাঘাট ও কল্যাণী

থানার সংখ্যা : ১৬টি (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Nadia, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

পুরুলিয়া



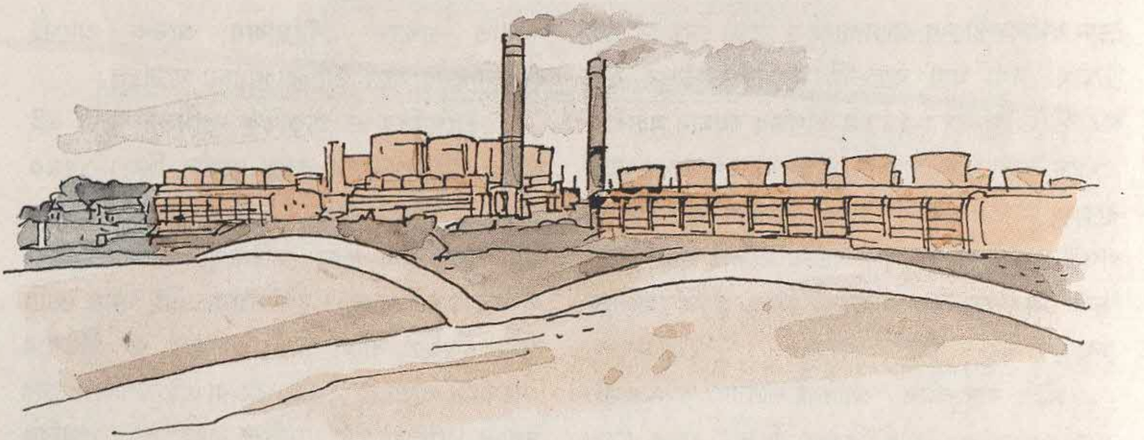
পুরুলিয়ার স্থানীয় নাম পুরুল্যে। ১৯৭১ সাল থেকে সার্ভে অব ইন্ডিয়ার মানচিত্রে তাই স্থানীয় মানুষের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে Purulia বানান হল Puruliya।

পুরুলিয়ার পূর্বনাম মানভূম। ১৮৩৮ সালে পূর্বতন মানভূম জেলার জেলা সদর হয়ে ওঠার আগে পুরুলিয়া ছিল একটি সাধারণ গ্রামের নাম। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তারপর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের অঙ্গিভূত হয়ে ছিল পুরুলিয়া। এই অঞ্চলের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়

জৈন ধর্মাবলম্বীদের আচারাঙ্গসুত্ত গ্রন্থে। সেখানে এর উল্লেখ দেখা যায় বজ্রভূমি নামে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনদের ২৪তম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর এখানে ভ্রমণকালে লক্ষ করেছিলেন এখানকার মাটি বজ্রের মতো কঠিন, সমগ্র এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ, পথহীন, মানুষগুলো রুক্ষ মাটির মতোই রুক্ষ, তারা ভিক্ষা না দিয়ে জৈন সাধুদের দিকে কুকুর লেলিয়ে দেয়।

এই বজ্রভূমির আদিবাসিন্দারা অনেকগুলি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে কুর্মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, বাউরি, কোরা, মাহালি, মুন্ডা উল্লেখযোগ্য। এরা যে গ্রামগুলিতে থাকত তার প্রত্যেকটির একটি করে গ্রামপ্রধান ছিল। তাকে বলা হত মুন্ডা। আদি অস্ট্রাল বা প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণিত নিষাদ জনগোষ্ঠীর লোকরা এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আজও পুরুলিয়ায় কুর্মি, সাঁওতাল, বাউরি ও ভূমিজরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনচতুষ্টয়। এই অঞ্চলে দ্রাবিড় প্রভাব ও সংমিশ্রণ ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। এর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে গ্রামনাম, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, লোকউৎসব ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। দ্রাবিড় ভাষায় পেরুল শব্দটির অর্থ নদী বা জল, পারু শব্দের অর্থ নুড়ি বা পাথরের চাঁই। লা বা ওলা শব্দের অর্থ মধ্যে। সুতরাং পুরুলিয়া বা পেরুল্লা বা পারুলার অর্থ হল পাথুরে ডাঙার মধ্যে অবস্থিত গ্রাম। আবার এই গ্রামনামের উৎস ধরেই পাওয়া যায় এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলির আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিচয়। যেমন ধরা যাক 'আরসা' নামের গ্রামটির কথা। তামিল ভাষায় 'আর' শব্দের অর্থ খনন করা, 'আরু' মানে চাষ। সা-অন্তে দ্রাবিড় ভাষায় অনেক গ্রামনাম দেখা যায়। 'আরসা' এইভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে তা হল পাথর বা পাহাড় ভেঙে যেখানে লাঙল পড়েছিল বা চাষ শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ এরা চাষবাস জানত। আর্য সংস্কৃতি এখানে পৌঁছোবার অনেক আগেই কৃষিজীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছিল।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দুর্গমতার জন্য এই অঞ্চল বহিরাগতদের কাছে দুর্ভেদ্য ছিল। ১৫৯০ সালে মানসিংহ প্রথম তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরে পৌঁছেছিলেন। পঞ্চকোট (পাঁচকোট) দুর্গ সম্ভবত এই সময় তৈরি হয়। ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি পাওয়ার পর ইংরেজরা এই অঞ্চল তাদের দখলে রাখতে প্রায় তেত্রিশ বছর ধরে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল, কারণ দেওয়ানি বলতে তারা বুঝত বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার রাজস্ব আদায় ও ভূসম্পত্তির তদারকি। এখানকার ছোটো ছোটো জমিদার ও অধিবাসীরা এটা মেনে নিতে পারেনি। ফলে বিভিন্ন সময়ে তারা নানা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল ইংরেজ বাহিনীকে। ইতিহাসে এই সংঘর্ষগুলো নানাভাবে খ্যাতি পেয়েছে, যেমন, ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা, কোল অভ্যুত্থান এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের বিস্তার উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহগুলোতে সিংহভাগ ভূমিকা নিয়েছিলেন ভূমিজ জনগোষ্ঠীর মানুষরা। সমগ্র অরণ্যাঞ্চল প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৮০৫ সালের রেগুলেশন আইনে মানভূম সহ ২৩টি পরগনা ও মহল নিয়ে গঠিত হয়েছিল জঙ্গলমহল জেলা। কিন্তু বিদ্রোহের আগুন যখন এইভাবে নেভানো গেল না জঙ্গলমহলকে আবার ভেঙে ফেলা হল। ১৮৩৩ সালে জন্ম হল মানভূমের। ১৯১১ সালে মানভূমকে বাংলা থেকে আলাদা করা হল। মানভূম ও ধলভূম দুটি জেলাই ছিল বাংলাভাষাভাষী প্রধান অঞ্চল। এই বিচ্ছেদ তাই কেউ সহজে মেনে নিতে পারল না। এরমধ্যে কেউ কেউ প্রস্তাব উঠিয়েছিল রাঁচি, পালামৌ, সিংভূম ও মানভূম জেলা নিয়ে একটি



সাঁততালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

পৃথক প্রদেশ গঠনের, এর প্রস্তাবিত নাম ছিল ছোটোনাগপুর রাজ্য। পৃথক করা না হলে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হোক—এরকম একটা দাবিও নিহিত ছিল ওই প্রস্তাবে।

স্বাধীনতার পর ১৯৫৩ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হল। ধানবাদ মহকুমার উপর পশ্চিমবঙ্গের দাবি নাকচ করল কমিশন। ধলভূম পরগনার কিছু অংশ ভেঙেও বাংলায় আনতে কমিশন রাজি হল না। অতুল চন্দ্র ঘোষ বঙ্গ-সত্যাগ্রহ পরিচালনা করলেন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর Bihar and West Bengal (Transfer and Territories Act) অনুসারে মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমা কিছু যোগ-বিয়োগ করে পশ্চিমবাংলার নতুন জেলা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হল।

বর্ধমান ডিভিশনের পশ্চিম সীমান্তের শেষ জেলা পুরুলিয়া। পুরুলিয়ার তিন দিক ঘিরে আছে বিহার রাজ্যের চারটি জেলা— উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ধানবাদ ও হাজারিবাগ, পশ্চিমে রাঁচি, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিংভূম। উত্তর-পূর্বে বর্ধমান, পূর্বের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাঁকুড়া জেলার সীমানা, দক্ষিণ-পূর্বে মেদিনীপুর।

জেলার পশ্চিমাংশ নিম্নমালভূমি ও পূর্বাংশ প্রস্তরযুক্ত সমতলভূমি। সমতলভূমিকে 'টাঁড়' ও অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিকে 'ডি' বলা হয়। জেলায় ছোটোনাগপুর মালভূমির বৈশিষ্ট্য জড়ানো। উত্তরে কয়লাখনি প্রধান গন্ডোয়ানা অববাহিকার মধ্যে পঞ্চকোট বা পাঁচেট অঞ্চলটি অবস্থিত। কয়লা ছাড়া এখানে পাওয়া যায় চুন, লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম। পুরুলিয়া শহর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অযোধ্যা পাহাড়, এর উচ্চতম শৃঙ্গ গোরগাবুরু বা গঙ্গাবুরু ২২২০ ফুট উঁচু। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যে এই পাহাড় জলবিভাজিকার রূপ নিয়েছে। পাহাড়টি কম-বেশি জঙ্গলে ঢাকা। দক্ষিণে দলমা এবং কেন্দ্রে সামান্য পশ্চিমে ঘেঁষে বাঘমুন্ডি শৈলশ্রেণী। জেলার পশ্চিমাংশের পাহাড়ি অঞ্চল নাইস, গ্রানাইট ও ল্যাটেরাইট দ্বারা গঠিত। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে খনিজ সম্পদে সবচেয়ে সমৃদ্ধ জেলা পুরুলিয়া।

এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থল। এরা হল কংসাবতী বা কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর বা ধলকিশোর এবং শিলাবতী বা শিলাই। শীত-গ্রীষ্মে মরা খাত এই নদীগুলোতে বর্ষায় বান



অযোধ্যাপাহাড় ও ছৌ-নাচের মুখোশ

ডাকে। সাঁওতালডি থেকে পাঞ্চেত জলাধার পর্যন্ত দামোদর বিহার রাজ্যের সঙ্গে পুরুলিয়ার সীমানা চিহ্নিত করেছে। জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী কাঁসাইয়ের জন্ম ঝালদা থানার জাবড় পাহাড়ে। জেলার তিন-পঞ্চমাংশ এলাকা এই নদীর জলে ধৌত হয়।

পাঁচেট, অযোধ্যা, দলমা এবং বাগমুন্ডির উচ্চভূমিতে পুরুলিয়ার অরণ্য অঞ্চল সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া কিছু অরণ্য বিক্ষিপ্তাকারে দেখা যায় শীলাই, দারকেশ্বর, কাঁসাই এবং আরকুশা উপত্যকায়। এই অরণ্যগুলোতে শাল গাছের প্রাধান্য।

অনুর্বর ল্যাটেরাইটযুক্ত মাটি সহজেই জলে ধুয়ে ও ক্ষয়ে যায়, জলধারণের ক্ষমতাও নেই বললেই চলে, তাই নদীর গতিপথে গভীর খাত তৈরি হয়। কৃষিকাজে জলসেচ ফলে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তবুও কৃষিই জেলার জীবীকা নির্বাহের প্রধান উৎস। আমন ধান সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত কৃষিপণ্য। এই ধান উৎপাদনের এলাকা মোট ধানি জমির ৯৭ শতাংশ। আখ, ডাল, ভুট্টা প্রভৃতিও কিছু কিছু চাষ করা হয়।

খনি থেকে কয়লা উত্তোলন ছাড়া বড়ো শিল্প জেলায় আর কিছু নেই। রানিপুর, হিরাখুন, ভামুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লা তোলা হয়। জেলার উত্তর-পূর্বে এই কয়লাখনিগুলি অবস্থিত।

ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে লাক্ষা শিল্প খুব প্রাচীন। এখন এই শিল্প পড়তির দিকে। বাঘমুন্ডি, ঝালদা, মানবাজার, রঘুনাথপুর অঞ্চলে এই শিল্প কেন্দ্রিভূত। অন্যদিকে ঝালদা অঞ্চলের চাষের যন্ত্রপাতি, ছুরি-কাঁচি এবং আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির অসংগঠিত শিল্পগুলির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ-নাচের মুখোশ তৈরি হয় পাড়া, আরসা, ঝালদা ১নং ব্লক ও সাঁতুড়ি অঞ্চলে। বিড়িশিল্প প্রতি থানাতেই আছে।

জেলার প্রধান ভাষা বাংলা, সংখ্যাগরিষ্ঠের

ভাষা। শতকরা একশো জন ভূমিজ, যাঁদের নিজস্ব ভাষা ছিল মুন্ডারি, বাংলাকে তাঁরা এখন মাতৃভাষা বলে জানে। বেশিরভাগ সাঁওতাল ও মুন্ডারাই বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা বলে দাবি করে। মাহাতো এবং মাহালিরাও এর ব্যতিক্রম নয়। আদিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়ায় সাঁওতালরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। জেলার জনসংখ্যার সিংহভাগ হিন্দু।

জেলায় আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে রঘুনাথপুর ছুঁয়ে চলে যাওয়া অহল্যাবাঈ রোড। প্রাচীনকালে এই পথটি ধরেই পাটলীপুত্র থেকে বণিক ও যাত্রীরা যেতেন তাম্রলিপ্তে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে (১৮৪০) পুরুলিয়া-ঝালদা-গোলা-রামগড় রোড সৈন্যবাহিনীর জন্য তৈরি হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দ্বারা জেলাটি কলকাতার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। রঘুনাথপুর থানায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্টেশন আছে। জেলার ব্যস্ততম রেলস্টেশন আদ্রা। বাঁকুড়া সড়কটি শহরের বুকের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ৩২নং জাতীয় সড়ক এই জেলায় পুরুলিয়া, জয়পুর এবং বলরামপুর থানার মধ্য দিয়ে ৬৪ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছে।

রঘুনাথপুর থানা এলাকায় সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও কলকাতা ঘুরে এই জেলায় বিদ্যুৎ পৌঁছোয় ছিঁটেফোঁটা। খরাপ্রবণ এই জেলায় জলসমস্যা আজও তেমনিই জ্বলন্ত। পুরুলিয়া শহরে কাঁসাই নদী ও সাহেব বাঁধ থেকে বর্ষাকালেও যা জল পাওয়া যায় তাতে প্রয়োজন মেটে না। শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পরিষেবাগুলোও যথেষ্ট অপ্রতুল।

পর্যটকদের জন্য পুরুলিয়া কম আকর্ষণীয় নয়। অযোধ্যা পাহাড়ের বনের আড়ালে লুকোনো 'বামনী' বা 'টুরগা' ঝরনার রূপে, কুইলাপালের রহস্যময় জঙ্গলের হাতছানিতে কিংবা দেউলঘাটার জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে (৯ম-১১শ শতাব্দীর) আছে পর্য্যটকদের মনজোগানোর আকর্ষণ।

এক নজরে পুরুলিয়া

আয়তন : ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

জনসংখ্যা : ২২ লক্ষ ২৪ হাজার (১৯৯১)

জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৩৫৫/বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)

বনাঞ্চল (মোট জমির) : ১৪.০৫ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৫৪.৬১ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৮৮.৩১ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)

কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৬১.৪০ (১৯৯১)

বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ১৪৮০টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)

বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ৮টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)

সাক্ষরতা : ৪৩.২৯ শতাংশ (১৯৯১)

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ১১৪ (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)

পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : ৭৯৪ কিলোমিটার (মার্চ ৩১, ১৯৯৪, পি. ডব্লু. রাস্তা)

কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : ১৫ কিলোমিটার (মার্চ ৩১, ১৯৯৪, পি. ডব্লু. রাস্তা)

মহকুমার সংখ্যা : ২ (১৯৯৬) পুরুলিয়া সদর ও রঘুনাথপুর

থানার সংখ্যা : ২০ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Puruliya, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

বর্ধমান



প্রাচীনকালে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ের বিভাজন রেখা ছিল অজয় নদ। গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই রাঢ় অঞ্চল। তাই বলা যায় প্রাচীন রাঢ়ের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল আজকের বর্ধমান। বর্ধমানের মল্লসারুল থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের একটি তাম্রশাসনে বর্ধমানভুক্তির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় এই সময় বঙ্গাধিপতি ছিলেন গোপচন্দ্র এবং তাঁর অধীনে মহাসামন্ত বিজয় সেন ছিলেন বর্ধমানভুক্তির উপরিক (শাসনকর্তা)। এই সময়ে রচিত 'বৃহৎসংহিতা'য় বরাহমিহিরও বর্ধমানের নাম উল্লেখ করেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও বর্ধমান জনপদের নাম পাওয়া যায় এবং বর্ধমানপুরের প্রাচীন পরিচয় পাওয়া যায় 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে।

আয়তনের দিক থেকে প্রাচীন বর্ধমানের সঙ্গে আজকের বর্ধমানের ফারাক বিস্তর। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ধমানভুক্তির পূর্ব সীমা হুগলি নদীর পশ্চিম তীর, দশম শতাব্দীতে এর দক্ষিণ সীমা সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে এর উত্তর সীমা অজয় নদীর পর পার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাল যুগের শেষের দিকে তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়, বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগনায় ঈশ্বরী ঘোষ বা ইছাই ঘোষ নামে জনৈক সামন্ত রাজা, বঙ্গাধিপতি গৌড়রাজকে উপেক্ষা করে এক স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান কাঁকসা থানার অন্তর্গত শ্যামরূপার গড় অঞ্চলে ঢেকুর নামক স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল। ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল' গ্রন্থে ইছাই ঘোষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের রাজত্বকালে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যকে যে ১৫টি সুবায় ভাগ করা



বিজয়তোরন

হয় তার মধ্যে বাংলা সুবা ছিল অন্যতম। এই সুবা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। 'আইন-ই-আকবরি'তে বর্ধমানকে সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত একটি মহাল বা পরগনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাহাঙ্গিরের রাজত্বের প্রথম দিকে জায়গিরদার 'শের আফগান' বিদ্রোহী হলে বাংলার শাসক কুতবউদ্দিন তাঁকে দমন করতে আসেন, উভয়ে পরস্পরের আঘাতে নিহত হন। বর্ধমান শহরে এই দুজনের সমাধি আজও বিদ্যমান। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী শাহজাদা খুর্‌রম (পরে সম্রাট শাহজাহান) বর্ধমানের দুর্গ ও শহর অধিকার করেন। মঙ্গলকোট ও বর্ধমান শহরে কয়েক মাস অবস্থান কালে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের শিলালিপিতে শাহজাহানের নাম খোদিত আছে। মুঘল আমলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্গম রায়ের উত্তরাধিকারী কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫-৯৬) বাদশাহ্ আওরেঙ্গজেবের ফরমান বলে বর্ধমানের জমিদারি ও চৌধুরি পদ প্রাপ্ত হন। মুঘল সম্রাটের সামান্য নগর কোতোয়াল ও রাজস্ব আদায়কারী পদ থেকে তিনি অল্পকালের মধ্যে সুবা বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন বলবত হলে বর্ধমান জমিদারির বিপুল সম্পত্তির সিংহভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চলে যায়। বর্তমান রাজপ্রাসাদ 'মহতাব মঞ্জিল' বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের দত্তক পুত্র মহতাব চাঁদ-এর (১৮৩২-৭৯) আমলে তৈরি। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মহতাব মঞ্জিলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কথিত আছে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুদূর পঞ্জাব অঞ্চলের ক্ষত্রী কাপুর বংশের লোক ছিলেন।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মিরকাশিম চাকলা বর্ধমান (মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামসহ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেয়। সে সময় বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও বীরভূম জেলার এক তৃতীয়াংশ নিয়ে চাকলা বর্ধমান গঠিত ছিল। বিভিন্ন জেলার সঙ্গে স্থান বিনিময়ের কাজ শেষ হয়ে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান বর্তমান আকার লাভ করে।

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক অবস্থান তরঙ্গায়িত রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে হলেও এর বেশিরভাগ অঞ্চল ভাগীরথী, দামোদর ও অজয় নদীর পলি দ্বারা গঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অনুসারে জেলাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (১) ভাগীরথীর পশ্চিম পাড় থেকে আউসগ্রাম থানার পূর্বসীমা পর্যন্ত ভূভাগের উচ্চতা ৪০ থেকে ৫০ মিটার, (২) আউসগ্রাম থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত ভূভাগ ৮০ মিটার এবং (৩) দুর্গাপুর থেকে বরাকর নদের সীমা পর্যন্ত ভূভাগটির উচ্চতা ৬০ থেকে ১১৫ মিটার। বরাকর ও অজয় নদ যেখানে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে সেই অঞ্চলে কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড় দেখা যায়। এদের সর্বাধিক উচ্চতা ৫০০ ফুটের বেশি নয়। চিত্তরঞ্জন, সালানপুর, হিরাপুর ও কুলটি থানার মাটি রুক্ষ ও পাথুরে। দুর্গাপুর মহকুমার পূর্বাংশ, বর্ধমান মহকুমার পশ্চিমাংশ এবং মঙ্গলকোট থানার পশ্চিমাংশের মাটি কাঁকুড়ে ও লালচে রঙের। লোককথায় বর্ধমান তাই 'রাঙা মাটির দেশ'।

অজয় নদ বিহারের সাঁওতাল পরগনা থেকে বেরিয়ে জেলার উত্তরাংশে বীরভূমের সঙ্গে সীমানা তৈরি করে কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীতে মিশেছে। দামোদরের জন্মও বিহারে। এই নদী জেলার দক্ষিণ সীমানা তৈরি করেছে বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে। পরে গঙ্গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বারকেশ্বর নদী জেলার দক্ষিণে হুগলি জেলার সঙ্গে ১০/১২ কিলোমিটার সীমানা চিহ্নিত করেছে। জেলার পূর্বাংশে ভাগীরথী-হুগলি প্রবাহিত। অজয় ও দামোদর বর্ষার জলে পুষ্ট। ফলে গ্রীষ্মে নদীগুলিতে প্রায় জল থাকে না। বর্ষায় আবার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আগে ভীষণ বন্যা হত। বিধ্বংসী তার চেহারা। দামোদরকে তাই বলা হত 'বর্ধমান তথা বাংলার দুঃখ'। দামোদরের প্রধান উপনদী বরাকরের উপর তিলাইয়া বাঁধ, বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কয়েক কিলোমিটার উপরে কোনার নদীতে আর একটি বাঁধ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দামোদরের উপর পাঞ্চেত হিল বাঁধ ও বরাকরের উপর মাইথন বাঁধ তৈরি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির সুবিধা করা হয়েছে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠিত হয়। দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ক সমগ্র ব্যবস্থাদির দায়িত্ব এই কর্পোরেশনের হাতে।

কাঁকসা থানার পূর্বাংশে প্রাচীন পলি ও নতুন পলি গঠিত সমভূমি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী। অন্যদিকে রুক্ষ-ঊষর পশ্চিমাংশ ল্যাটেরাইট ও গন্ডোয়ানা শিলা দ্বারা গঠিত। এই ভূভাগ কৃষির অনুপযুক্ত, কিন্তু খনি ও বনভূমির অবস্থিতির জন্য এই অঞ্চলে শিল্পোন্নতি সম্ভব হয়েছে। আধুনিক কালে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে প্রথম শহর রানিগঞ্জ এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসানসোল শহরের পত্তন হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বার্নপুর ও কুলটিতে লৌহ-ইস্পাত কারখানা ও অন্ডালে রেলওয়ে কলোনি স্থাপিত হয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রেলপথের সম্প্রসারণ জেলার সদর শহর বর্ধমানের পূর্বদিকে বিস্তৃতি লাভের সহায়ক হয়।

ভারতে কয়লা খনির সন্ধান প্রথম রানিগঞ্জেই পাওয়া যায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখানে কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হয় ১৮২০

খ্রিস্টাব্দে। রানিগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই কয়লাখনি অঞ্চল বিস্তৃত। সারাভারতের প্রায় ৩০ শতাংশ কয়লা এখানে সঞ্চিত আছে। ১৯৭৫ সালে কয়লাখনিগুলিকে জাতীয়করণ করে 'কোলইন্ডিয়া' নামে ভারত সরকারের একটি সংস্থার অধীনে আনা হয়। চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা এবং কল্যাণপুরে বাইসাইকেল নির্মাণের কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দুর্গাপুর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প সম্প্রসারণ ঘটে। এই শিল্প সমৃদ্ধির জন্য দুর্গাপুরকে ভারতের 'রূঢ়' বলা হয়।

শিল্পের মতো জেলাটি কৃষিতেও উন্নত। বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র জেলা যেখানে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটেছে। জেলার ৫৪ শতাংশ মানুষ কৃষিতে নিযুক্ত, মোট জমির প্রায় ৮৬ শতাংশ জমি ধান চাষে ব্যবহার করা হয়। শালি (নিচু জমি, যার জলধারণের ক্ষমতা বেশি এবং উর্বর) জমিতে আমন ধানের চাষ হয় এবং সুনা (অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি) আউস ধানের উপযুক্ত। সুনা জমিতে ধান ছাড়া আলু, আখ, ডাল প্রভৃতি ফসল জন্মায়। দুর্গাপুরের ৬৯২ মিটার লম্বা ডিভিসি ব্যারেজ থেকে ২৪৮০ বর্গ কিলোমিটার কৃষি জমির জন্য সেচের জল পাওয়া যায়। কৃষিজাত পণ্যের প্রাচুর্য হেতু এই জেলাকে বলা হয় 'পশ্চিমবঙ্গের শস্যাগার'।

পূর্ব রেলপথের প্রধান শাখা ছাড়াও এই রেলপথের হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, হাওড়া-বারহাড়োয়া, হাওড়া-কিউল এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের আসানসোল-আদ্রা শাখা এই জেলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। শের শাহের আমলে (১৫৩৯-৪০) নির্মিত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে ১৫৮ কিমি পথ।



কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির

সামরিক প্রয়োজনে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই জেলায় চারটি বিমানক্ষেত্র নির্মিত হয়। এদের মধ্যে আসানসোলের নিঙ্গা এবং পানাগড়ের কাছে বিরুতিহাতে যথাক্রমে মালবাহী ও বিশেষ যাত্রীবাহী বিমান অবতরণ করে।

নবপ্রস্তর যুগ শেষ হয়ে তাম্রপ্রস্তর যুগের উন্মেষকালে যে নগর সভ্যতার বিজয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া গেছে এই জেলার আউসগ্রাম থানার (বোলপুর শান্তিনিকেতনের কাছে) পান্ডুরাজার ঢিবিতে। অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে মঙ্গলকোটে সম্প্রতি (১৯৯০) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে একটানা এক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলার মতো বর্ধমানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও লোকসংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই জেলায় অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আলপাইন মানবগোষ্ঠীসম্ভূত মানুষ অজয়

দামোদর উপত্যকায় বসবাস করত। তাদেরই ধর্মীয় বিশ্বাস আজও নানা দেবদেবীর রূপ ধরে লৌকিকসংস্কৃতির ধারা বজায় রেখেছে। এইরকম একটি দেবী হলেন মনসা, যাঁর পূজার প্রাধান্য অন্য যে-কোনো জেলার চেয়ে এই জেলায় বেশি। 'মনসামঙ্গলের' 'চম্পকনগরী'র অবস্থান এই জেলার বুদবুদ থানায়। রাঢ়ের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে শিব ও ধর্মরাজ সবার উপরে অধিষ্ঠিত। জেলার মন্দিরগুলির মধ্যে শিবমন্দিরের প্রাধান্য দেখা যায়। দুটি ১০৯ শিবক্ষেত্র রয়েছে— একটি কালনায়, অন্যটি নবাবহাটে।

বর্ধমানের চুরুলিয়া বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) জন্মস্থান হিসাবে খ্যাত। প্রতি বছর ১১ জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করে সপ্তাহকালব্যাপী সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলা বসে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) অজয় নদের তীরবর্তী কোগ্রামে বাস করতেন। তিনি সুললিত ছন্দে তাঁর বাসভূমির ছবিটি এঁকেছেন এইভাবে :

'বাড়ি আমার ভাঙনধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে সোহাগভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।'

এ ছাড়া বর্ধমানের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের আঙিনায় যাঁদের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে কবি ও সাহিত্য-সমালোচক কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস (জন্ম : কাটোয়া থানার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে), 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচয়িতা মালাধর বসু (রচনাকাল : ১৪৭৩-৭৪ থেকে ১৪৮০-৮১; জন্ম: বর্ধমানের কুলীনগ্রামে) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বর্ধমানের মিষ্টি, যা কালক্রমে প্রবাদ হয়ে উঠেছিল, তার কথা না বললে জেলার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই মিষ্টান্ন দ্রব্যের মধ্যে মানকরের খাজা ও কদমা, বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, সাতগাছিয়ার মাখাসন্দেশ, মেমারির রসগোল্লা ও দইয়ের নাম করা যেতে পারে।

এক নজরে বর্ধমান

আয়তন : ৭০২৪ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৮৬১/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ৩.৯৬ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭র গড়)
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৬৩.৩৪ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭র গড়)
কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৯৬.৫৯ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭র গড়)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৫০.৯০ (১৯৯১)
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ২৪১১টি (১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ৪৯টি (১৯৯৪)
সাক্ষরতা : ৬১.৮৮ শতাংশ (১৯৯১)
হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ৪১৬ (১৯৯৪)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : ১৯২৭ কিলোমিটার (পি. ডব্লু. রাস্তা, ১৯৯৪)
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : ১২ কিলোমিটার (পি. ডব্লু. রাস্তা, ১৯৯৪)
মহকুমার সংখ্যা : ৬ (১৯৯৬) বর্ধমান (উত্তর), বর্ধমান (দক্ষিণ), আসানসোল, দুর্গাপুর, কাটোয়া ও কালনা।
থানার সংখ্যা : ৩২ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Burdwan, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

বাঁকুড়া



মহাভারতে বর্ণিত সুহ্মভূমি বা জৈনদের আচারাঙ্গ সূত্র বর্ণিত রাঢ় বা লাঢ়-এর কেন্দ্রে ছিল আজকের বাঁকুড়া। রাঢ়ের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমতীর থেকে ছোটোনাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলটি ছিল বীরভূম জেলা, ভাগীরথীর পশ্চিম পারের মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হাওড়া ও হুগলি জেলার কিছু অংশ। রাঢ়ের অধিবাসীদের বেদ ও পুরাণে নিষাদ বলা হয়েছে। এদের সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির কোনো মিল ছিল না। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের পর থেকে সুহ্ম নামের পরিবর্তে রাঢ় নামটি প্রচলিত হয়ে ওঠে। সাঁওতালি ভাষায় লার্ মানে সূতো, রাড়্ মানে সুর, লাড় মানে সাপ। হয়তো জৈন ও গ্রিক লেখকরা এই মুল অস্ট্রিক লাড় শব্দটি এই অঞ্চল চিহ্নিত করতে ব্যবহার করেছেন বলে অনেকে মনে করেন—রুক্ষ, কর্কশ, দুর্গম, জঙ্গলাকীর্ণ সাপ-শ্বাপদ- সংকুল অঞ্চলকে এইভাবে বর্ণনা করাই উপযুক্ত বোধ হয়েছে তাঁদের। রাঢ় অঞ্চল জুড়ে

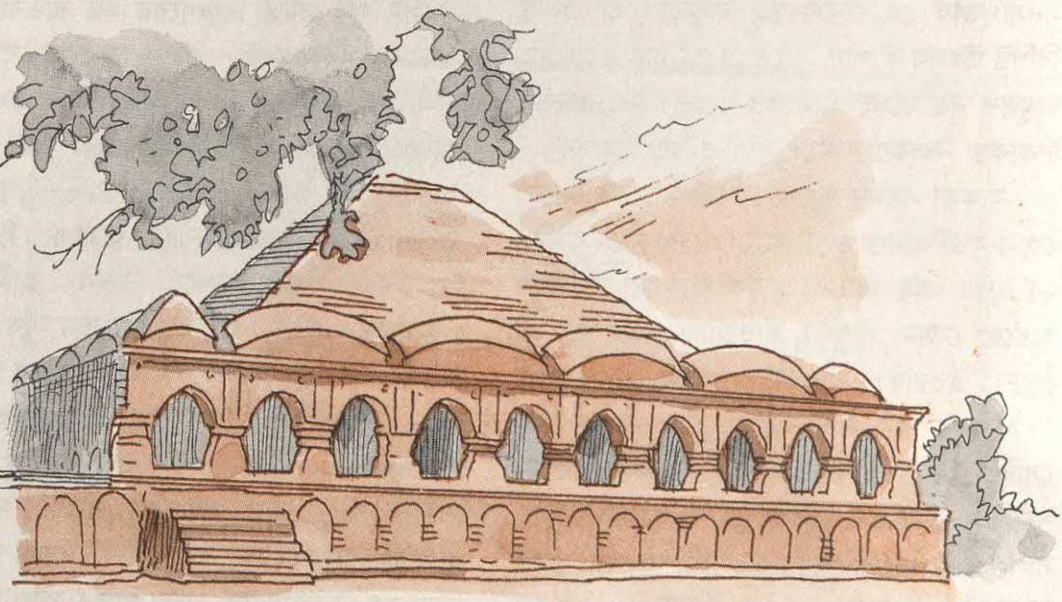
মনসাপূজার যে জনপ্রিয়তা, বাঁকুড়ায় যা একটি বিশিষ্ট উৎসব ঝাঁপান, তাতে এ অনুমান একেবারে অমূলক নয় বলেই অনেকের ধারণা। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সুহ্ম ও রাঢ় সমার্থক।

বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। কোল-মুন্ডা ভাষায় ওড়াঃ বা ড়া শব্দের মানে বসতি। ড়া জুড়ে তাই রাঢ়ের অনেক জায়গার নামকরণ হয়েছে, যেমন, বাঁকুড়া, হাওড়া, রিষড়া, খাতড়া, চুঁচুড়া ইত্যাদি। বাঁকুড়ায় অতীব প্রভাবশালী ধর্মঠাকুরের অন্য নাম বাঁকুড়া রায়। জেলার নাম সেদিক থেকেও আসতে পারে কারণ ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বঙ্ক (আঁকা-বাঁকা, সর্পিল), অপভ্রংশে বাঁকু, যার অর্থ আশ্চর্য সুন্দর, যাকে পূজা দিতে হয়। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেনালের ম্যাপে ''Bancoorah''-র উল্লেখ আছে। ১৮৬৩ সালে গ্যাসট্রেল সাহেবের একটি রিপোর্টে এই অঞ্চলকে বানকুন্ডা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এরকম আরও অনেক মত আছে।

বাংলায় আর্যীকরণ শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব, চতুর্থ শতকে মৌর্য যুগে। বিহারের মধ্য দিয়ে আর্যভাষীদের বাংলায় অনুপ্রবেশ ঘটেছিল—উত্তরবঙ্গে মিথিলা থেকে, অঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে।

এই ঘটনার নিদর্শন হিসাবে বাঁকুড়া শহরের ১৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপির উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই লিপি সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে লিখিত। এটি ছিল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রাজা চন্দ্রবর্মনের সময়কার। বাংলায় সংস্কৃত ভাষায় এটিই প্রাচীনতম প্রস্তরলিপি। অষ্টম শতকের প্রথম দিকে একটি ক্ষুদ্র অরণ্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদিমল্ল বা রঘুনাথ। এই মল্লরাজাই বাঁকুড়া জেলার বৃহৎ অংশ জুড়ে এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের কাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন। তখন থেকে ইংরেজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের বিবর্তনের ইতিহাসই এই জেলার বৃহত্তর জনজীবনের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের মূল প্রবাহটি নিয়ন্ত্রিত করেছিল। হান্টার সাহেব [W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, 1868 Appendix E] রঘুনাথকে বাগদি রাজা বলে চিহ্নিত করেছেন। বাগদি বলতে তিনি আদিবাসী বুঝিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে এই আদিবাসীরাই এই অঞ্চলে ১১০০ বছর ধরে রাজত্ব করছে। মল্লরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় বিষ্ণুপুরের নাম ছিল মল্লভূম। মল্ল বা মাল ও বাগদিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে অনেকের ধারণা, সম্ভবত বাগদিরা মাল জাতিরই একটা শাখা। এদের আদিম মাতৃভাষা 'মালতো'তে মাল শব্দের অর্থ মানব। 'মালতো' ভাষা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কুরুক ভাষার সঙ্গে অনেক মিল আছে। দ্রাবিড় ভাষায় মালা শব্দের অর্থ পাহাড়। তাই মালের শব্দটি মানে হল পাহাড়িয়া মানব। এরা আগে রাজমহল পাহাড় এবং রামগড় পাহাড়েরই অধিবাসী ছিল।

ক্ষত্রিয় উপাধি 'সিংহ' ব্যবহার করার আগে বিষ্ণুপুরের রাজারা দীর্ঘদিন ধরে 'মল্ল' পদবি ব্যবহার করে এসেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে (১৫৮৬ খ্রি.) বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল থেকে বিষ্ণুপুর রাজাদের মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারা যায়। মুসলমান রাজাদের সঙ্গে কখনো শত্রুতার কখনো মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় বিষ্ণুপুর রাজ্য একটি জমিদারিতে পরিণত হয়ে চাকলা (কয়েকটি পরগনার সমষ্টি = চাকলা, জেলা) বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিষ্ণুপুর জমিদারি ইংরেজের হাতে চলে যায়। এই সময় থেকে বিষ্ণুপুরের প্রাধান্য নষ্ট হতে থাকে। এরপর মারাঠা (বর্গি) আক্রমণ ও ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে রাজ্যটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।



বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম ও বিষ্ণুপুর একটি জেলায় পরিণত হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে আবার বীরভূম থেকে পৃথক হয়ে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের সদ্য গঠিত জঙ্গলমহল জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে চুয়াড় বিদ্রোহ (যা গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা নামে পরিচিত) ঘটে। তখন জঙ্গলমহল ভেঙে বিষ্ণুপুর অঞ্চল বর্ধমান ভুক্ত হয়। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুর অঞ্চল পৃথক হয়ে বাঁকুড়াকে সদর করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা গঠিত হয়। বর্তমান বাঁকুড়া জেলার জন্ম হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।

বাঁকুড়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে বর্ধমান, পূর্ব-দক্ষিণে হুগলি, দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে পুরুলিয়া। জেলাটিকে কয়েকটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায় :

(১) ছোটোনাগপুরের মালভূমির অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল। বাঁকুড়া জেলায় উল্লেখযোগ্য দুটি পাহাড়—শালতোড়া থানার বিহারীনাথ (৪৪৭.৮ মিটার) এবং ছাতনা থানার শুশুনিয়া পাহাড় (৪৩৯.৫ মিটার)।

(২) উঁচু-নিচু ল্যাটেরাইট উচ্চভূমি ও উপত্যকা নিয়ে জেলার মধ্যাঞ্চল এবং

(৩) পূর্ব দিকে বিষ্ণুপুর ও সদর মহকুমার অধিকাংশ পলিগঠিত নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমি। বিহারীনাথ থেকে মেজিয়া পর্যন্ত যেতে বাঁদিকে দেখা যায় শুধু পাহাড় আর টিলা। মেজিয়া পাহাড় থেকে বাঁকুড়া শহরের দিকে যেতে মাঝামাঝি রাস্তায় অমরকানন গ্রাম। তার গা ঘেঁষে উঠেছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কোড়ো বা কারো পাহাড়। গঙ্গাজলঘাটি থানার মধ্যে অবস্থান।

এই জেলা অনেকরকম খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। শালতোড়, মেজিয়া, বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটি থানা অঞ্চলের কয়লা, থানাপাহাড়, চেরাডংরি ইত্যাদি অঞ্চলে টাংস্টেন, রানিবাঁধ থানার ঝিলিমিলিতে অভ্রের সঞ্চয়, রায়পুর থানা অঞ্চলের কেওলিন বা চিনেমাটির সঞ্চয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

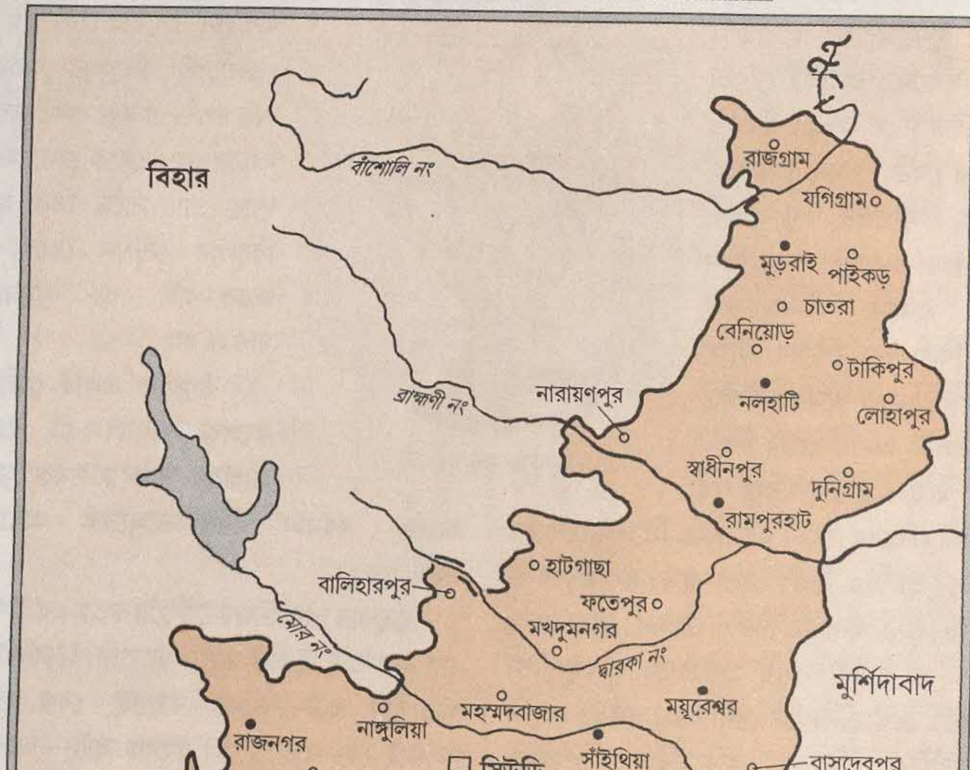
ছোটোনাগপুরের মালভূমি থেকে নিবিড় বনভূমি ক্রমে পূবের দিকে এসে পাতলা হয়েছে। এই জঙ্গলে আছে পিয়াশাল, সেগুন, বহেড়া, কুসুম, পলাশ, মহুয়া, ডুমুর, সজিনা, আম, জাম, কাঁঠাল, পিপল, বাবলা ইত্যাদি গাছ। ছোটোগাছ বা আগাছার ভেতর উল্লেখযোগ্য আশশেওড়া, বনওকলা, ভাট, ধুতুরা, কুয়াচি, নিশিন্দা ইত্যাদি। খুঁটির জন্য শালের খুব কদর। কেঁদ পাতা বিড়িশিল্পে একটি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। কাগজশিল্পের জন্য দরকারি কাঁচামাল পাওয়া যায় শাল, ইউক্যালিপটাস, মেনুরি, সাবুই ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি থেকে। মহুয়ার ফুল থেকে মদ তৈরি হয়। এই ফুল, কাঁচা ও শুকনো, এখানকার গরিব মানুষদের প্রায় তিন মাসের খাদ্য। চাল ও আনাজ কেনা সাধ্যের বাইরে গেলে মহুয়ার শুকনো ফুল আটা বা যবের ছাতুর সঙ্গে মিশিয়ে এরা রুটি তৈরি করে খায়।

জঙ্গলে জীবজন্তুর সংখ্যা এখন অনেক কম। আগে শালতোড় ও রায়পুর থানার নিবিড় জঙ্গলে বাঘ ঘুরে বেড়াত। এখন গ্রামের নামের সঙ্গে বাঘ শব্দটাই শুধু রয়ে গেছে : বাঘনেজা, বাঘজুড়ি, বাঘডিহা, বাঘডোবা ইত্যাদি। নেকড়ে, হায়না, ভালুকও ছিল। রানিবাঁধ জঙ্গলে এখনও নেকড়ে দু-একটা চোখে পড়ে। ভালুকও দেখা যায় কখনো-সখনো শুশুনিয়া পাহাড় ও ঝিলিমিলির জঙ্গলে। হাতিও একসময় ছিল প্রচুর। বুনো শুকর, খরগোশ, বনরুই, বাঁদর ও হনুমান বনের সর্বত্রই আছে। বন অনুপাতে পাখির সংখ্যা কম।

বাঁকুড়া জেলার উত্তরে শালতোড় থানার মধ্য দিয়ে এই জেলার প্রধান নদী দামোদর প্রবেশ করেছে। এর জন্ম ছোটোনাগপুরের পালামৌ জেলায়। বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী সীমানা চিহ্নিত করেছে এই নদী। এরপর প্রধান নদী দারকেশ্বর। অন্য নাম ধলকিশোর বা ঢলকিশোর, পুরুলিয়ায় জন্ম। এই নদীই মেদিনীপুরে ঢুকে রূপনারায়ণ হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে কাঁসাই বা কংসাবতী, কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য রঘুবংশে যার নাম কপিশা, রয়েছে এর উপনদী কুমারী, তারাফেনী ইত্যাদি। দারকেশ্বরের প্রধান উপনদী শিলাই বা শিলাবতী এই জেলার মধ্যে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে বিস্তৃত; মেদিনীপুরে গিয়ে দারকেশ্বরের সঙ্গে আবার মিলিত হয়েছে। এত নদ-নদী থাকা সত্ত্বেও শীতের শেষে এবং গ্রীষ্মকালে জেলার উত্তর ও পশ্চিমের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। ১৯৪৮ সালে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) ও ১৯৫৬ সালে কংসাবতী সেচপ্রকল্প শুরু হয়েছিল। ডিভিসির উপযোগিতা বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের কাজে সীমাবদ্ধ। কংসাবতী প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেচের কাজে জলের ব্যবস্থা করা। ১৯৬৪ সালে এই প্রকল্পের সেচের কাজ শুরু হয়। এই প্রকল্পগুলো আংশিক প্রয়োজন মেটাতে পেরেছে। জেলার সত্তরভাগ কৃষিজমি এখনও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। জেলার শতকরা ৮২ জন কৃষিজীবী। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এর মধ্যে অধিকাংশ আবার অনুর্বর।

বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতিতে অতীতকাল থেকেই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কৃষির অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দানের চেষ্টা করে এসেছে। বাঁকুড়াবাসীদের জীবিকার দ্বিতীয় বিকল্প হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, এখনও করছে। রেশম, তসর ও সূতি বয়ন ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। গাঢ় লাল রঙের 'ধূপছায়া' শাড়ির খ্যাতি বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ছাড়া রেশম ও সূতি মিশ্রিত 'খুটনি' কাপড়, 'ফুলম শাড়ি'রও কম কদর ছিল না। ইদানীং বিষ্ণুপুরের 'বালুচরি' শাড়ি নাম করেছে। বাঁকুড়ার রপ্তানিজাত

বীরভূম



বীরভূম বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির পর বীরভূম মুর্শিদাবাদ থেকে শাসিত হত। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই ছিল এই জেলার শাসনকেন্দ্র। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া জেলার পূর্বাংশ) এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমকে স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর এই জেলার পশ্চিমাংশের উচ্চভূমি নবগঠিত জেলা সাঁওতাল পরগনায় চলে যায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে

বীরভূমের বারওয়ান (১০৮ বর্গমাইল এলাকা) মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় আর মুর্শিদাবাদের লালগঞ্জ মহকুমা থেকে বীরভূমে চলে আসে রামপুরহাট ও নলহাটি থানা।

প্রাচীনতম জৈন গ্রন্থ 'আয়ারাঙ্গ সূত্র' বা 'আচারাঙ্গ সূত্র' অনুসারে বীরভূম বজ্জ বা বজ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বজ্রভূমি ছিল রাঢ়ের উত্তরাংশ। উত্তর-রাঢ়, অনুমান করা হয়েছে, এখনকার বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহবীর এই অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। বীরভূম মৌর্য, গুপ্ত, শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। এরপর আড়াইশো বছর ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। দশম শতাব্দীতে পালরাজাদের শাসনাধীনে আসে বীরভূম। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। অর্থাৎ বীরভূম সেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জয়দেব এই জেলায় অজয় নদীর তীরে কেন্দুলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বসবাস করেছিলেন বেশ কিছুদিন। 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর একটি গ্রন্থে (*The Literature of Bengal,* 1895) বলেছেন : জয়দেবের সময় বাংলার ভাষা বাংলা হলেও শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা সংস্কৃত ভাষাকে তাঁদের বিশেষ উত্তরাধীকার বলে মনে করতেন এবং লিখিত ভাষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন। রাজসভার ভাষাও ছিল সংস্কৃত। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় ছিল মৃত ভাষার আড়ষ্ঠতা। ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর সব রচনাই আজ বিস্মৃত, একমাত্র ব্যতীক্রম জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' একটি মহান ব্যতীক্রম।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীরভূম মুসলমান শাসনের অধীনে আসে। মুঘল আমলে এখানকার আফগান জায়গিরদাররা বেশ শক্তিশালী ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সময় (১৭০১-২৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত বীরভূমের আসাদুল্লা খান ছিলেন বঙ্গের অন্যতম প্রধান জমিদার। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বাংলার নবাব মিরকাশিম ও ইংরেজ একজোট হয়ে আসাদুল্লাকে পরাজিত করে বীরভূমে ইংরেজ শাসন কায়েম করে।

ভবিষ্যৎপুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে বীরভূমের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : 'ভাগীরথীর পশ্চিমে, দ্বারকেশ্বরীর উত্তরে অবস্থিত নারিখণ্ড নামের জেলাটি, জঙ্গলাকীর্ণ। প্রধানত অর্জুন, শখোট এবং শালের প্রাচুর্য এই জঙ্গলে। জেলার তিন-চতুর্থাংশ জঙ্গল আচ্ছাদিত, বাকি এক-চতুর্থাংশে চাষবাস হয়। ...জলের কোনো অভাব নেই। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অসংখ্য ছোটো ছোটো জলধারা প্রবাহিত। এরমধ্যে প্রধান হচ্ছে অজয়। অনেক জায়গায় লৌহখনি আছে। এখানকার মানুষগুলো ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, নীতিধর্মের ধার ধারে না। তিরধনুক ব্যবহারে সব্যসাচী, কৃষিকাজে পরিশ্রমী...।' ভবিষ্যৎপুরাণ বর্ণিত এই অঞ্চল পরিচিত ছিল বীরদেশ বা বীরভূমি নামে। মুসলমান আধিপত্য এই অঞ্চলে ছিল নামেমাত্র। এল. এস. এস. ওমালি (বীরভূমের গেজেটিয়ার রচয়িতা, ১৯১০) অনুমান করেছেন যে এই জেলার পশ্চিমাংশ বীররাজাদের শাসনাধীনে ছিল। এবং মুসলমান আধিপত্য এঁদের শাসনকে দুর্বল করতে পারেনি।

কেউ কেউ অনুমান করেন বীরভূম নামটি 'বীর' পদবীযুক্ত ওই প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ থেকে এসেছে। অনেকে মনে করেন জেলার নামটি মুন্ডারি ভাষার 'বির' শব্দ থেকে এসেছে কারণ ওই ভাষায় শব্দটির অর্থ 'জঙ্গল'। অতীতের জঙ্গলাকীর্ণ বীরভূমের এইরকম নামসূত্র খুব বেশি কষ্টকল্পনাপ্রসূত নাও হতে পারে বলে অনেকের ধারণা।



রাধাবিনোদ মন্দির ও বাউল

বীরভূম রুক্ষ রাঢ়ের অংশ। এর মাটি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলের মতোই। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বীরভূমে দেখা যায় আর্কিয়ানযুগের নাইস শিলা, গন্ডোয়ানা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা এবং গাঙ্গেয় পলি। জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ পলিগঠিত সমভূমি। এখান থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন পর্যন্ত পৌঁছোনোর কিছুটা আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় লাল ল্যাটেরাইট মাটির এলাকা। এরপর থেকে জমির উচ্চতাও বাড়তে থাকে, জমিতে পাওয়া যায় পাথুরে রুক্ষতার আভাস। জেলার ভূমির ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে গড়ানো। নলহাটি থানায় ছাড়া ছাড়া কিছু ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। যেমন, সেওড়া পাহাড়ি, পাঁচ পাহাড়ি, কাঁটা পাহাড়ি এবং কাঙ্গাল পাহাড়ি। ময়ুরাক্ষী ও অজয় নদীর মধ্যবর্তী গড়ানো ভূভাগের ছবির মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে।

ময়ুরাক্ষী বা মোর, অজয়, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, কোপাই প্রভৃতি নদী জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। অজয় বীরভূম ও বর্ধমান জেলার প্রাকৃতিক সীমা রচনা করেছে। ময়ুরাক্ষী নদী জেলাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বহমান। সিউড়ির অদূরে ময়ুরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া ব্যারেজ ও বিহারের সাঁওতাল পরগনার মশানজোড়ে 'কানাডা বাঁধ' তৈরি করে সেচ ও বিদ্যুৎ তৈরিতে জলসম্পদকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রামপুরহাট থানা অঞ্চলের ব্যাপক এলাকা জুড়ে মাটির ক্ষয় খুবই বেশি। এই অঞ্চলে চাষযোগ্য জমিরও ভীষণ অভাব।

জেলায় ধান, গম, পাট, আখ, আলু, তৈলবীজ

প্রভৃতির চাষ হয়। তবে ধান জেলার প্রধান ফসল। প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতে ধান চাষ হয়। আমন ধানের চাষ সর্বাধিক।

জেলায় বড়ো শিল্প কিছু নেই। গনুটিয়ার রেশম শিল্প এবং ইলামবাজারের লাক্ষা শিল্প একসময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল। রামপুরহাট থানা অঞ্চলে এখনও রেশমগুটির চাষ ও রেশম বয়নের কাজ হয়। আহমেদপুরে চিনির কল আছে। বিড়ি তৈরি একটি উল্লেখযোগ্য কুটীরশিল্প।

তদানীন্তন পূর্বভারতীয় রেলপথের সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন (ব্রড গেজ) চালু হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। এটি জেলার কেন্দ্র থেকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। একটি শাখালাইন নলহাটি থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত পূর্ব দিকে চলে গেছে। অন্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনে সিউড়ি অবস্থিত। 'সিউড়ি-সাঁইথিয়া', 'সাঁইথিয়া-মহেশ', 'সিউড়ি-রাজনগর', 'সিউড়ি-ইলামবাজার-পানাগড়' প্রভৃতি রাস্তা আছে এই জেলায়। বাসযোগে বিহারের দুমকা, দেওঘর এবং ভাগলপুরে পৌঁছে যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন এবং বক্রেশ্বর সরাসরি বাস চলাচল করে।

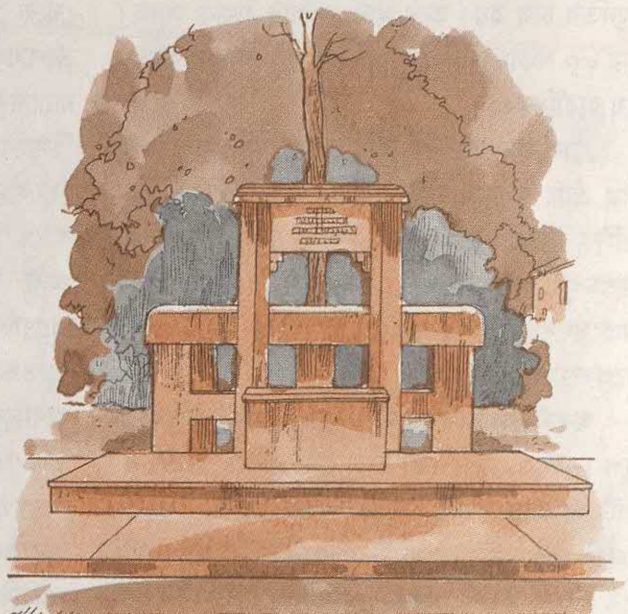
নব্বই শতাংশের উপর মানুষ বাংলাভাষী। সাঁওতালভাষীরা এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার মানুষও এই জেলায় বাস করেন। সাঁওতালভাষীদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখা যায় মহম্মদ বাজার, বোলপুর, রাজনগর, সাঁইথিয়া, ইলামবাজার প্রভৃতি থানা অঞ্চলে।

বীরভূম বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব পীঠস্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। জলজোল গ্রামে (বোলপুর থেকে ৮ কিলোমিটার) একান্ন পীঠের অন্যতম কংকালীর মন্দির আছে। এখানে সতীর কোমর (কাঁকাল) পড়েছিল। তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, নলহাটি এবং সাঁইথিয়ার নন্দিকেশ্বরীর মন্দিরও একান্নপীঠের অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। সিউড়ি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে বক্রেশ্বরের সদ্য সমাপ্ত তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলেও এটি তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে বাংলার মানুষের কাছে অনেকদিন আগে থেকেই সুপরিচিত। এখানে গন্ধকযুক্ত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। শিবরাত্রীর দিন মেলা হয় এখানে, চলে সাত-আট দিন। তারাপীঠে সতীর চোখের তারা পড়েছিল। এই মহাপীঠ সাধক বামাক্ষ্যাপার স্মৃতিধন্য। বোলপুর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত লাভপুর গ্রামে সতীর ঠোঁট পড়েছিল বলে এটি অন্যতম মহাপীঠ। এখানে দেবী ফুল্লরার মন্দির বিখ্যাত। মাঘী পূর্ণিমায় এখানে 'ফুল্লরা' মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই লাভপুর গ্রামেই প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫.৭.১৮৯৮-১৪.৯.১৯৭১) জন্ম গ্রহন করেন।

এ ছাড়া আছে জয়দেব গোস্বামী ও চণ্ডীদাসের (১৪১৭-১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দ) জন্মস্থান যথাক্রমে কেঁদুলি ও নান্নুর। অজয় নদীর তীরে অবস্থিত কেঁদুলিতে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে জয়দেব গোস্বামীর মহোৎসব বলে একটা বড়ো মেলা হয়। এই মেলায় অনেক বাউলের সমাবেশ ঘটে। এই বাউলরা মেলার একটা বড়ো আকর্ষণ। জয়দেবের নিজহাতে প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব জিউ-র মন্দির আজও আছে, আর আছে তাঁর সমাধী। সিউড়ি মহকুমার একটি ছোট্ট গ্রাম নান্নুর। এই গ্রামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খননকার্য চালিয়ে গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা, টেরাকোটার কাজ ইত্যাদির মতো প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতার নিদর্শনগুলি পেয়েছে। চণ্ডীদাসের জন্মের সময় এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। চণ্ডীদাস নিজে ছিলেন তন্ত্রসাধনার সহজীয়া ধারার লোক। পরে বৈষ্ণব হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। চণ্ডীদাসের আরাধ্যা ছিলেন

অন্যতম মহাবিদ্যা বাঁসুলী দেবী। কার্তিক মাসে নান্নুরে মেলা বসে।

কলকাতা থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরত্বে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য শান্তিনিকেতন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর মৌজায় ভুবনডাঙ্গা গ্রামে 'শান্তিনিকেতন' নামে এক গৃহ নির্মাণ করেন। কালক্রমে সেই গৃহের নাম থেকে সমগ্র জায়গাটির নামকরণ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এখানে গড়ে ওঠে 'বসুধৈবকুটুম্বকম'-এর (বিশ্ববাসী তোমার আপনজন) আদর্শে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার বিশেষ আকর্ষণ পৌষ উৎসব, পৌষ মেলা, ২২ শ্রাবণ উপলক্ষে হলকর্ষণ-বৃক্ষরোপণ উৎসব, মার্চে দোল পূর্ণিমায় বসন্ত উৎসব ইত্যাদি। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন বোলপুর মহকুমা শহরের মর্যাদা লাভ করে।



শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা

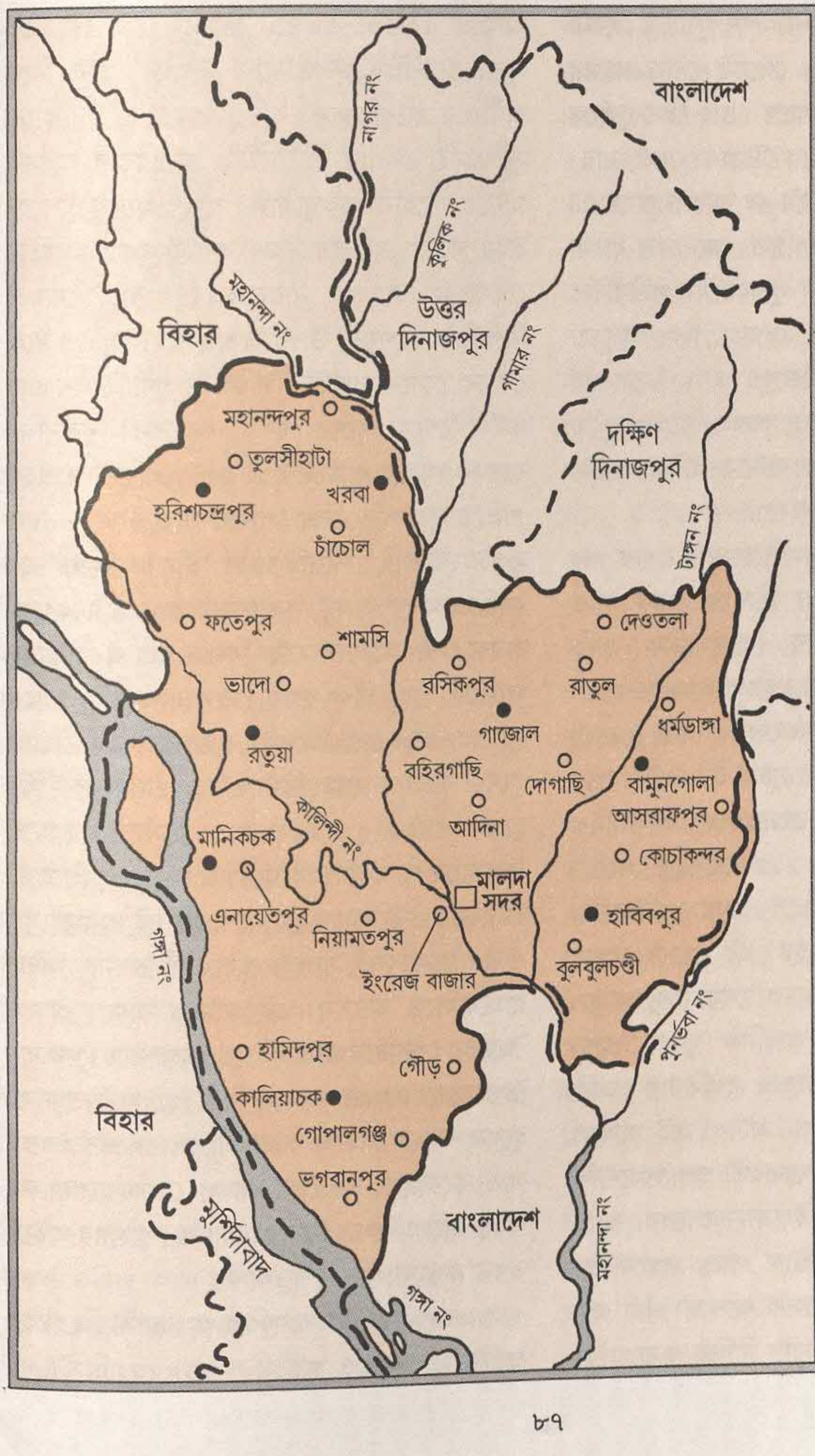
প্রাচীন ও আধুনিক উভয় অর্থেই বীরভূম আজ তীর্থভূমি। লাল ধুলোমাখা রাঢ়ের টানে রবীন্দ্রনাথও বাউল হয়েছেন : 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে।' বীরভূমেই পেতেছেন তাঁর বিশ্বসংসারের আসনখানি।

এক নজরে বীরভূম

আয়তন : ৪৫৪৫ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ২৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬০০ জন (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৫৬২/প্রতি বর্গকিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ৩.৫২ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৭৫.১৩ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কর্ষিত জমি : (মোট চাষযোগ্য জমির) ৯৭.৭৩ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৬৬.০২ (১৯৯১)
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ২২১৩টি (১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ৭টি (১৯৯৪)
সাক্ষরতা : ৪৮.৫৬ শতাংশ (১৯৯১)
হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা: ১২২ (১৯৯৪)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : ৯৮৪ কিলোমিটার (১৯৯৪ : পি. ডব্লু. রাস্তা)
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : ৯ কিলোমিটার (১৯৯৪ : পি. ডব্লু. রাস্তা)
মহকুমার সংখ্যা : ৩ (১৯৯৬) : সিউড়ি সদর, বোলপুর ও রামপুরহাট
থানার সংখ্যা : ১৭ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার*; *Dist Statistical Handbook, Birbhum, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

মালদা



'মলদ' নামে এক কৌমগোষ্ঠী অনেকদিন আগে এই অঞ্চলে বাস করত। মনে করা হয় এই 'মলদ' শব্দ থেকেই মালদা, মালদহ ইত্যাদি নামগুলির সৃষ্টি। অন্য মতে ফারসি 'মাল' এবং বাংলা 'দহ' এই দুই শব্দের মিলনেই মালদহ নামের জন্ম। 'মাল' শব্দের অর্থ 'সম্পদ' আর 'দহ' শব্দের অর্থ সাগর। অর্থাৎ এক সমৃদ্ধ জনপদ বোঝাতেই এই নামের ব্যবহার।

মালদা ছিল প্রাচীন গৌড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত। মুর্শিদাবাদ-বীরভূমই এই জনপদের আদি কেন্দ্র। পরে মালদহ এবং বর্ধমানও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানের এই কয়টি জেলা নিয়েই প্রাচীন গৌড়। ইতিহাসে গৌড়ের প্রথম উদয় ঘটে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কিছু আগে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে

বরাহমিহির তাঁর ‘বৃহৎসংহিতা’ গ্রন্থে গৌড়কে বাংলার অংশবিশেষ বলে উল্লেখ করে গেছেন। একসময় বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে গুড় হত। কেউ কেউ মনে করেন এই গুড় থেকেই গৌড় নামের উৎপত্তি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৪র্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত) গৌড়দেশের পণ্যের উল্লেখ দেখা যায়। বর্তমান মালদার পাণ্ডুয়া নামে যে জায়গা আছে তা জেলার বরিন্দ এলাকায় অবস্থিত। অনেকের ধারণা যে আজকের পাণ্ডুয়া প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পরিবর্তিত রূপ। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের এলাকা ছিল বগুড়া-রাজশাহির উত্তরাংশ, দিনাজপুর এবং উত্তর-পূর্ব মালদা নিয়ে। মালদার বরেন্দ্র অঞ্চল, যা মধ্যযুগীয় আরবিভাষী ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় বরিন্দ, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনেরই একটি বড়ো অংশ।

৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক সিংহাসনে বসার পর গৌড় একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর (আনুমানিক ৬৭১ খ্রিস্টাব্দ) পর গৌড়ে একশো বছর ধরে অরাজকতার রাজ্য চলে। এইসময় গোপালদেবের রাজা হওয়ার মধ্য দিয়ে গৌড়ে পালবংশের সূচনা হয়। এই বংশের শেষ রাজা মদনপালের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে আসা কর্ণাটক্ষত্রিয় সেন রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়। এই বংশের লক্ষ্মণ সেনই ছিলেন প্রাচীন গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজা। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি (আধুনিক তুরস্ক দেশ) জাতীয় এক যুদ্ধব্যবসায়ী মহম্মদ বখতিয়ার খলজি গৌড়ে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটায়। এই আমলে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী হল লখনৌতি যা এই জেলার অধুনা ইংরেজবাজারের কাছে অবস্থিত ছিল। ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লখনৌতির সিংহাসনে অন্তত নয়জন শাসক বসেছে। এঁরা প্রায় সবাই মামলুক বা মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলের প্রকৃত উদ্বোধন ঘটে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ্-র আমলে (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ) কারণ, এই সুলতান দিল্লির সুলতানদের বশ্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। যদিও প্রকৃত অর্থে কোনো সুলতানই বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটাতে পারেনি। ফকরুদ্দিনের রাজত্বকালেই মিশরের ইবন বতুতা বাংলায় ভ্রমণ করতে আসেন। তিনি দেখেছেন বাংলা নানারকম করের বোঝায় নিপীড়িত, হিন্দুদের উপর অত্যাচার। কিন্তু এর মধ্যে কোনো কোনো সুলতান পণ্ডিত ও গুণী ছিলেন এবং ধর্মনির্বিশেষে গুণের কদর করতেন। রুকনুদ্দিন বরাবক শাহের আমলে (১৪৫৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) হিন্দু পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র ‘পণ্ডিত সার্বভৌম’ ও ‘রায় মুকুট’ উপাধি পেয়েছিলেন। ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’-এর রচয়িতা মালাধর বসু, সুলতানের অন্তরঙ্গ চিকিৎসক অনন্ত সেন, মন্ত্রীদের মধ্যে বিশ্বাস রায় এবং আরও অনেকে যাঁরা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও বরাবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন কেবল তাঁদের নিজেদের গুণে। বাংলার শেষ বিখ্যাত সুলতান আলউদ্দিন হুশেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) আমলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। বাংলায় পর্তুগিজদের আগমনও এই সময়। হুসেন শাহের দুই অমাত্য রূপ ও সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে শ্রীচৈতন্য মালদার রামকেলিতে আসেন। এই ঘটনার স্মরণে আজও জ্যৈষ্ঠের শেষদিনে রামকেলিতে মেলা বসে। মালদায় চৈতন্যদেবের আর-একজন শিষ্য ছিলেন নিত্যানন্দ। হুশেন শাহের আমলে বাংলা সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। শশাঙ্কের আমল থেকে হুশেন সাহ পর্যন্ত বাংলা ছিল গৌড়ের সমার্থক। বাংলার বাইরে তখন বাঙালি ছিল গৌড়বাসী।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রভাব মালদাতেও পড়েছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের



দাখিল দরওয়াজা

সাঁওতাল বিদ্রোহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাভূত হলে কোম্পানির সৈন্যদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য পুরুলিয়া, বীরভূম ও বিহারের সাঁওতাল পরগনা থেকে সাঁওতালরা মালদায় চলে এসেছিল। এই সাঁওতালরাই ১৯৩২ সালে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দমন করতে পুলিশ এলে পুলিশের বন্দুক আর সাঁওতালদের তির-ধনুক, বল্লম-তরোয়াল-এর অসম যুদ্ধ শুরু হল। সাঁওতালরা এই সময় পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদকে দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করেছিল। আজও আদিনা মসজিদের গায়ে গুলিবর্ষণের চিহ্নগুলো ওই বিদ্রোহের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে মালদা কোনো আলাদা জেলা ছিল না। বর্তমান জেলার কিছু অংশ ছিল পুর্নিয়া জেলায়। বাকি অংশ ছিল দিনাজপুর জেলায় অন্তর্গত। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলা রাজশাহি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ভাগলপুর বিভাগের মধ্যে যায়। ১৯০৫ সালে আবার রাজশাহি বিভাগে ফিরে আসে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের রায় অনুযায়ী ১৭ আগস্ট মালদা ভারতে আসবে না পাকিস্তানে যাবে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। মালদা ভারতের অংশ হলেও শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর থানাগুলি পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) চলে যায়।

মালদা জেলার উত্তরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ, পূর্বদিকে বাংলাদেশ (দিনাজপুর জেলা) ও পশ্চিমে বিহারের পুর্নিয়া জেলা। জেলাটি জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত।

মালদায় তিন ধরনের ভূমি দেখতে পাওয়া যায়। বারিন্দ, টাল এবং দিয়ারা। মহানন্দা নদীর পূর্ব প্রান্তে বারিন্দ অঞ্চল। গাজোল, হবিবপুর, বামুনগোলা নিয়ে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলের মাটি লাল, জমির উপরিভাগ উঁচু-নিচু। এই অঞ্চলের তলা দিয়ে ঢেউ খেলানো গ্র্যানিট পাথরের স্তর চলে গেছে, যাকে বলা হয় 'বেঙ্গল বেসিন', মেঘালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গারো, খাসি পাহাড়ের রূপ ধরেছে। অনেকরকম আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করেও এই স্তরকে ভেদ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই অঞ্চলে গভীর বা অগভীর কোনো নলকূপই বসানো যায় না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই অভেদ্য স্তরের নীচে খনিজ তেলের ভাণ্ডার মজুত রয়েছে। মহানন্দার পশ্চিম পাড়ে রয়েছে টাল অঞ্চল। এখানকার মাটির রং কালো এবং নীল। খরবা, হরিশচন্দ্রপুর ও রতুয়ার কিছু অংশে নিয়ে টাল। এখানকার জমি নিচু। ফলে সহজেই বন্যা কবলিত হয়। টাল অঞ্চল ক্রমশ দক্ষিণে ও পশ্চিমে ঢালু হয়ে দিয়ারা অঞ্চলের সঙ্গে মিশেছে। কালিন্দী নদীর দক্ষিণে এবং মহানন্দার পশ্চিমে দিয়ারা অঞ্চল বিস্তৃত। দিয়ারা মালদার সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল। দিয়ারা আসলে গঙ্গার চর। ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, রতুয়া থানার কিছু অংশ নিয়ে দিয়ারা গঠিত।

মালদার প্রধান নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা, মহানন্দা,

কালিন্দী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা মালদায় এসে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি শাখা ভাগীরথী নাম নিয়ে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, অন্য শাখাটি বাংলাদেশে (রাজশাহি) গিয়ে পদ্মা হয়েছে। মহানন্দা নদী দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বিহারের অনেকটা অংশ অতিক্রম করে মালদায় প্রবেশ করেছে। মহানন্দা মালদাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। মালদা জেলা গেজেটিয়ার ১৯১৮-তে বলা হয়েছে জেলার যাতায়াত ব্যবস্থা বেশিরভাগ নির্ভরশীল ছিল নদীর উপর। আজ মহানন্দা, পুনর্ভবা ও টাঙন প্রবাহিত হয়েছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে, তা সত্ত্বেও রাজমহল-মানিকচক ফেরি ব্যবস্থা, খেজুরিয়া ঘাট, ধুলিয়ান ফেরি ব্যবস্থা এখনও বর্তমান। এবং মহানন্দার উপর দিয়ে এখনও রোজ প্রচুর নৌকা ইংরেজবাজার থেকে ওল্ড মালদা যাতায়াত করছে।

স্থলপথের আজ অনেক উন্নতি হয়েছে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়িগামী যানবাহন ৩৪নং জাতীয় সড়ক ধরে ফরাক্কা সেতু পার হয়ে মালদা জেলার কালিয়াচক, ইংরেজবাজার এবং গাজোল থানা ছুঁয়ে দিনাজপুর জেলায় (দক্ষিণ) প্রবেশ করে। মালদা জেলার উপর দিয়ে জাতীয় সড়কটির বিস্তৃতি ১০৭.৯ কিলোমিটার। সরকারি কাজ ও আম রপ্তানির জন্য মালদায় একটা বিমান বন্দরও আছে।

কৃষিফসলের মধ্যে ধান, গম, ডাল, পাট ও কিছু পরিমাণ আখ ও আলুর চাষ হয় এই জেলায়। ধানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমন, তারপর বোরো এবং সবশেষে আউশ ধান উৎপন্ন হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে বোরো ফসলের চাষ সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল। মালদার খ্যাতি আমের জন্য। ইংরেজবাজার, ওল্ড মালদা, রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক, খরবা ও হরিশচন্দ্রপুরে আমের চাষ হয়। ফজলি আমের ফলনই সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৫০ হাজার একর জমিতে আম চাষ করা হয়। ক্ষিরসাপাতি, কিষাণভোগ, গোপালভোগ, বৃন্দাবনী, ল্যাংড়া ইত্যাদি জাতের আমও উল্লেখযোগ্য।


ফিরোজমিনার

মালদায় আধুনিক কলকারখানা কিছু নেই। তবে এখানকার রেশম শিল্প খুব প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৪র্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) গৌড়ের রেশম বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। আইন-ই-আকবরিতে 'গঙ্গাজল' নামে যে মূল্যবান রেশমি কাপড়ের উল্লেখ আছে তা তৈরি হত এই গৌড়েই। এখানকার মটকার শাড়িও বিখ্যাত। এ ছাড়া আছে ঐতিহ্যবাহী কাঁসা শিল্প। নবাবগঞ্জ অঞ্চলে কাঁসা শিল্প সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছিল। সেটি এখন বাংলাদেশে। বর্তমানে মালদার তাঁত, কাঁসা, আমের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য

শিল্প, বিড়ি, মৃৎশিল্প, ইটভাটা প্রভৃতি ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পই উল্লেখযোগ্য। কালিয়াচক, মানিকচক, ইংরেজবাজার এই তিনটি থানাতেই বস্ত্রশিল্পের সমাবেশ ঘটেছে। কাঁসা শিল্প বর্তমানে ধ্বংসের মুখে। রেশম শিল্পের জন্য মালদা এখনও বিখ্যাত। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬৫ শতাংশ তুঁতই এই জেলায় চাষ হয়। এখানকার রেশম পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায়। এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে এবং অস্ট্রেলিয়ায় আম ও আমজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। দিনাজপুর থেকে জেলার আভ্যন্তরীন প্রয়োজন মেটাতে চাল আমদানি করতে হয়। মালদার রসকদম ও কানসাট নামের মিষ্টি নাম করা।

মালদায় হিন্দু বাঙালি, মৈথিল ব্রাহ্মণ, জৈন আগরওয়ালা ও হিন্দু মাহেশ্বরী শ্রেণির কিছু মাড়োয়ারি, বাদিয়া মুসলমান ইত্যাদি ছাড়াও এখানে অনেক আদিবাসী রয়েছে। এদের মধ্যে সাঁওতাল, রাজবংশী, কোচ, মুন্ডা, ওরাঁও প্রধান। মৈথিল ব্রাহ্মণরা হিন্দি ও বাংলা মিলিয়ে 'খোট্টা' নামে এক মিশ্রভাষায় কথা বলে। হিন্দু ও মুসলমানদেরও ওই ভাষায় কথা বলতে শোনা যায়, বিশেষত মানিকচক ও রতুয়া থানা এলাকায়। মালদা জেলার লোক মূলত বাংলা ভাষায় কথা বললেও সে ভাষার একটা উপভাষাগত চরিত্র রয়েছে : মুকত্ মদু প্যাটত্ বিষ (মুখে মধু পেটে বিষ), কামডাত্ একনও হাত দিইনি (কাজটিতে এখনও হাত দিইনি)।

মালদা জেলায় গ্রামীন জীবনে মেলার গুরুত্ব এখনও কমেনি। প্রায় চারশো বছরের প্রাচীন রামকেলি মেলা সাত দিন ধরে চলে। কোজাগরী পূর্ণিমায় কোতওয়ালি ও আড়পুরে বাইচের মেলায় নৌকা প্রতিযোগিতা প্রধান আকর্ষণ। মেলাটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। হবিবপুর থানার জোতগোকুল, রতুয়া থানার ফরিদপুর ও বেরুল এবং খরবা থানার ক্ষেমপুর গ্রামে গম্ভীরা পূজা উপলক্ষে মেলা বসে প্রতি বৈশাখে। সাঁওতালদের নিজস্ব মেলা ছাড়াও এদের বাঁধনা উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের সব্-এ-বরাত্ উপলক্ষে ঐতিহ্যপূর্ণ পেরুয়া মেলা। এই মেলা বসে গাজোল থানার পাণ্ডুয়া গ্রামে। মালদার সবচেয়ে লোকপ্রিয় দেবতা শিব। জহুরাকালী সর্বাধিক পূজিতা লোকদেবী, চণ্ডীদেবীর মন্ত্রে এঁর পূজা হয়।

গম্ভীরা বলতে মালদহের বিশিষ্ট লোক উৎসবকেই বোঝায়। অতীতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যেই এর জন্ম ইতিহাস নিহিত বলে অনেকের ধারণা। গম্ভীরা আসলে শিবের মহিমা কীর্তন। গ্রাম্য গায়কেরা এই গানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অন্য কোনো বৃহত্তর সমস্যাকেও এই গানের মধ্য দিয়ে কটাক্ষ করে। যেমন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল গম্ভীরা গানের গায়কেরা সেই সুদূর ঔপনিবেশিক যুগে :

স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা
খ্যাতে দিব মানিককলা, নইলে আইট্যা কলা।
বানিয়া হইল দ্যাশপতি,
কি বলব ভাই দ্যাশের গতি।

মালদহে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের ছড়াছড়ি। গৌড়-পাণ্ডুয়ার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখার জিনিস। গৌড় নগরী যে চওড়া প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল তার ভগ্নাবশেষ ৩০ ফুট উঁচু, ১৫০ ফুট চওড়া দেওয়াল এখনও আছে। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতেই এই প্রাচীরের ব্যবস্থা, আইন-ই-আকবরিতে বলা হয়েছে। গৌড়ে রয়েছে বারদুয়ারি মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, ফিরোজ মিনার, চামকাঠি মসজিদ, লুকোচুরি দরজা, কদম রসুল, চিকা মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি প্রত্নসম্পদ। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে এখানকার কয়েকটি



আদিনা মসজিদ

দিঘিও উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্য ও আকারের দিক থেকে আদিনা মসজিদ সমালোচকদের চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মালদার পাণ্ডুয়াতে এর অবস্থান। ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু করে দশ বছর ধরে এই মসজিদ তৈরি হয়। 'আদিনা' ফারসি শব্দ, অর্থ শুক্রবার। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে দিনটি পবিত্র। সিকন্দার শাহ বোধ হয় তাই মসজিদের এই নাম রেখেছিলেন।

মালদহে প্রত্নসম্ভারের এত প্রাচুর্য দেখে অনেকেই একে বলে ইতিহাসগর্ভ মালদা।

এক নজরে মালদা

আয়তন : ৩৭৩৩ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ২৬ লক্ষ ৩৭ হাজার (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৭০৬/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ০.৫৬ শতাংশ (পাঁচ বছরের গড় ১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭)
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৭৮.৭৩ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৯৬.৮৯ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৬৩.১৩ (১৯৯১)
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ১৫৯৬টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ৪টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
সাক্ষরতা : ৩৫.৬২ শতাংশ (১৯৯১)
হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ১২৯ (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : ৫৯২ কিলোমিটার (পি. ডব্লু. রাস্তা)
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : ১৬ কিলোমিটার (পি. ডব্লু. রাস্তা)
মহকুমার সংখ্যা : ১ (১৯৯৬) মালদা সদর
থানার সংখ্যা : ১১ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Malda, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

মুর্শিদাবাদ



মুর্শিদাবাদ দক্ষিণবঙ্গের শেষ জেলা। এরপর থেকে উত্তরবঙ্গের শুরু। উত্তর-পশ্চিম থেকে গঙ্গা নেমে এসে এই জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা থানায় প্রবেশ করেছে। এইখানেই ফরাক্কা বাঁধ। এখান থেকে গঙ্গার প্রবাহ দ্বিধাবিভক্ত। একটি অংশ ভাগীরথী (নবদ্বীপ পর্যন্ত), অন্য অংশ এই জেলার ধুলিয়ান পার হয়ে পদ্মা হয়েছে। ভাগীরথীর এই প্রবাহ মুর্শিদাবাদকে পূর্ব ও পশ্চিম প্রধানত এই দুইভাগে ভাগ করেছে। পূর্বভাগ বাগড়ি ও পশ্চিমভাগ রাঢ় নামে পরিচিত। রাঢ়-বাংলার অন্য অংশের সঙ্গে

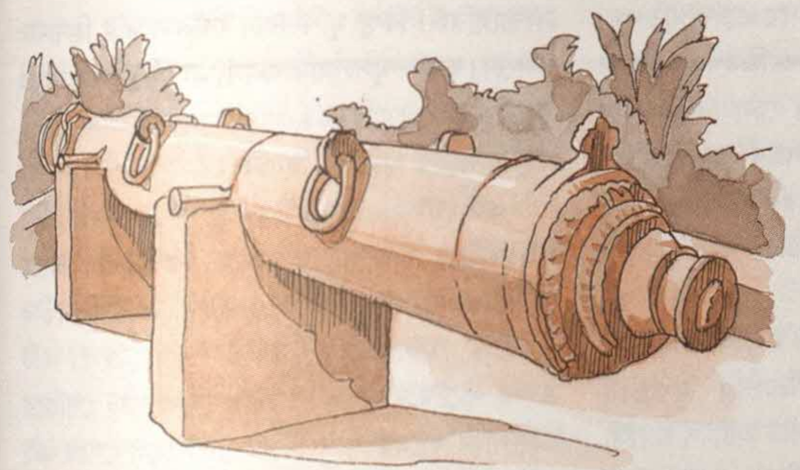
মুর্শিদাবাদের রাঢ়কে তুলনা করলে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য খুব বেশি দেখা যায় না। কঠিনে কোমলে রাঢ়। ঢেউ খেলানো শুকনো, নিরস জমির সঙ্গে সমতল বা প্রায় সমতল দো-আঁশ মাটির উর্বরতা। অন্যদিকে বাগড়ি অঞ্চল পলিগঠিত, বন্যাপ্লাবিত, নিম্নভূমি, অতি উর্বর।

সপ্তম শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ছিল গৌড়ের কেন্দ্রভূমি। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় বা বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায় যে শশাঙ্ক সেই সময় ছিলেন গৌড়ের রাজা। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল এই জেলার রাঙামাটি অঞ্চলে। যদিও বাঙলায় মুসলমান যুগের শুরুতে মালদার লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামে অভিহিত হয় এবং মুসলমান যুগের শেষভাগে গৌড় বলতে সমস্ত বাংলাকেই বোঝাত। মুর্শিদাবাদ বাংলায় মুসলমান রাজপ্রতিনিধিদের শেষ রাজধানী। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদ নামে মুর্শিদাবাদের এক গণ্ডগ্রামে স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানটি কলকাতা থেকে ১৯৭ কিলোমিটার দূরে শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথে মুর্শিদাবাদ স্টেশন থেকে ২ কিলোমিটার পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। মুকসুদাবাদ মুর্শিদকুলি খাঁর নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হয়। মুর্শিদকলি খাঁরও দেওয়ান থেকে নবাবি পদে উন্নতি ঘটে। এঁর আমলে এখানে বহু প্রাসাদ, কেল্লা, দরবারগৃহ, মসজিদ তৈরি হয়। মুর্শিদাবাদে তাদের ধ্বংস চিহ্ন আজও বর্তমান।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজের উত্থান ঘটলে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। নবাবি আমলে গণ্ডগ্রাম হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধশালী জনপদ—বাংলা, বিহার, ওড়িশার রাজধানী। ইংরেজ আমলে (শুধু ১৭৫৭ থেকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) ইংরেজদের দ্বারা বাংলার সম্পদের বল্গাহীন লুণ্ঠনের চরম পরিণতি হিসাবে বাংলায় দেখা দিয়েছিল বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ ১৭৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে বা বাংলা ১১৭৬ অব্দে যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' 'Plassey plunder' নামে খ্যাত। এই লুট বিখ্যাত হয়েছিল 'পলাশি লুট' বা নামে। শুধু এই জেলাঞ্চলেই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়ল এক তৃতীয়াংশ লোক এবং মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক।

জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের আত্মপ্রকাশ ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল থেকে। ১৮৭৯ সালের পর জেলার আয়তনের আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখন বীরভূম জেলার নলহাটি ও রামপুরহাট একসময় মুর্শিদাবাদে ছিল, আর মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানা ছিল বীরভূমে। এই জেলার উত্তরে মালদহ, উত্তর-পূর্বে রাজশাহি (বাংলাদেশ), পশ্চিমে বীরভূম এবং দক্ষিণে নদীয়া ও বর্ধমান। যে মুর্শিদাবাদ একসময় রাজধানী ছিল আজ তার নামের বিশেষত্ব লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ নামের থানায় এসে ঠেকেছে। জেলাটি প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

জেলায় প্রধান নদী গঙ্গা-ভাগীরথী ছাড়াও আছে রাঢ় অঞ্চলের নদী বাঁশলাই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা ও ময়ুরাক্ষী আর বাগড়ির ভৈরব ও জলঙ্গি। রাঢ় ও বাগড়ি উভয় অঞ্চলের অনেক জায়গায় নদী মজে বিল ও বদ্ধ জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। বাগড়ি অঞ্চলের পলিগঠিত উর্বর মাটিতে পাট ও আউস ধান হয়। জলসেচের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় ধূসর রাঢ়ের শুষ্কতা কাটিয়ে চাষের ফসল ফলাতে বৃষ্টির মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় কৃষকদের। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের উন্নয়ন ও কৃষি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে রচিত 'কান্দি মাস্টার প্ল্যান' আজও বাস্তব রূপায়ণের অপেক্ষায়। ভাগীরথীর তীরবর্তী পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূর পর্যন্ত নদী বিধৌত পলিমাটি, যার



জাহানকোষা কামান

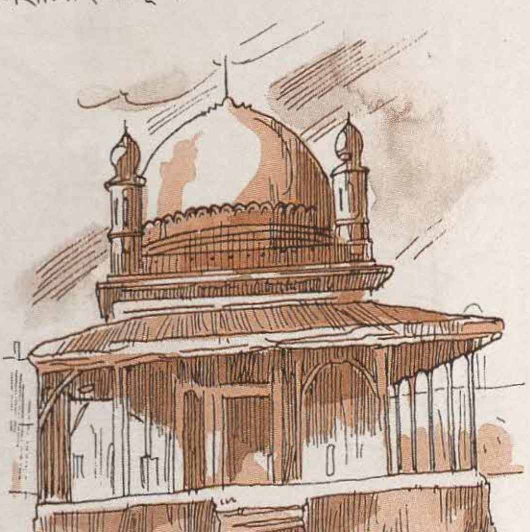
এই শিল্পের তাঁতিরা খড়গ্রাম, রানিনগর, বারওয়ান প্রভৃতি ব্লকে বসবাস করেন। ঐতিহ্যমন্ডিত বালুচরি শাড়ির জন্য এই জেলার জিয়াগঞ্জ অঞ্চল বিখ্যাত। এই জেলার হাতির দাঁতের কাজ একসময় যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মুর্শিদাবাদের খাগড়া, বহরমপুর, কান্দি, বরানগর এবং জঙ্গিপুর অঞ্চলে পিতল-কাঁসার বাসন তৈরি শিল্প এখনও পুরোনো ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে।

৩৪নং জাতীয় সড়ক এই জেলার মধ্যে বহরমপুর, বেলডাঙা, সুতি, সাগরদিঘি প্রভৃতি অঞ্চল হয়ে ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছে। রাজ্য সড়কগুলি কুলি-মোরগ্রাম এবং মোরগ্রাম-নলহাটির (বীরভূম) মধ্য প্রসারিত। কান্দি, খড়গ্রাম,

নাম রেতি মাটি, দেখা যায়। বিল অঞ্চলে মাটির রং কালো এবং উর্বর। রাঢ় অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান। এ ছাড়া গম, আলু, আখ, পাট ইত্যাদির চাষ হয়।

বীরভূম জেলা সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলে লাল মাটিতে একসময় প্রচুর শাল, পিয়াশাল, মহুয়ার জঙ্গল ছিল। বাঘ, বুনোমহিষ ইত্যাদির মতো বন্য প্রাণীরও অভাব ছিল না এই জঙ্গলে। এখন সেখানে কৃষিভূমি, আর অতীত অরণ্যের ছিটেফোঁটা। বাগড়ি অঞ্চলের লালগোলা ও ভগবানগোলা থানা এলাকায় প্রচুর আমের বাগান আছে, সঙ্গে এখানে-সেখানে শিমুল, হিজলের ব্যতিক্রম।

ফরাক্কার ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কর্পোরেশন (N.T.P.C.) ছাড়া জেলায় বৃহৎ শিল্প কিছু নেই। ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প তিনশো বছরের পুরোনো। আলিবর্দি খাঁর (১৬৭৬-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে এই শিল্পের প্রভুত উন্নতি ঘটে। রেশমচাষ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান কৃষিভিত্তিক গ্রামীন শিল্প। রেশম বস্ত্র বয়ন শিল্প পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কেবলমাত্র এই জেলা এবং বীরভূমের মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন অঞ্চলেই কেন্দ্রিভূত।



সিরাজউদ্দৌলা নির্মিত মেদিনা

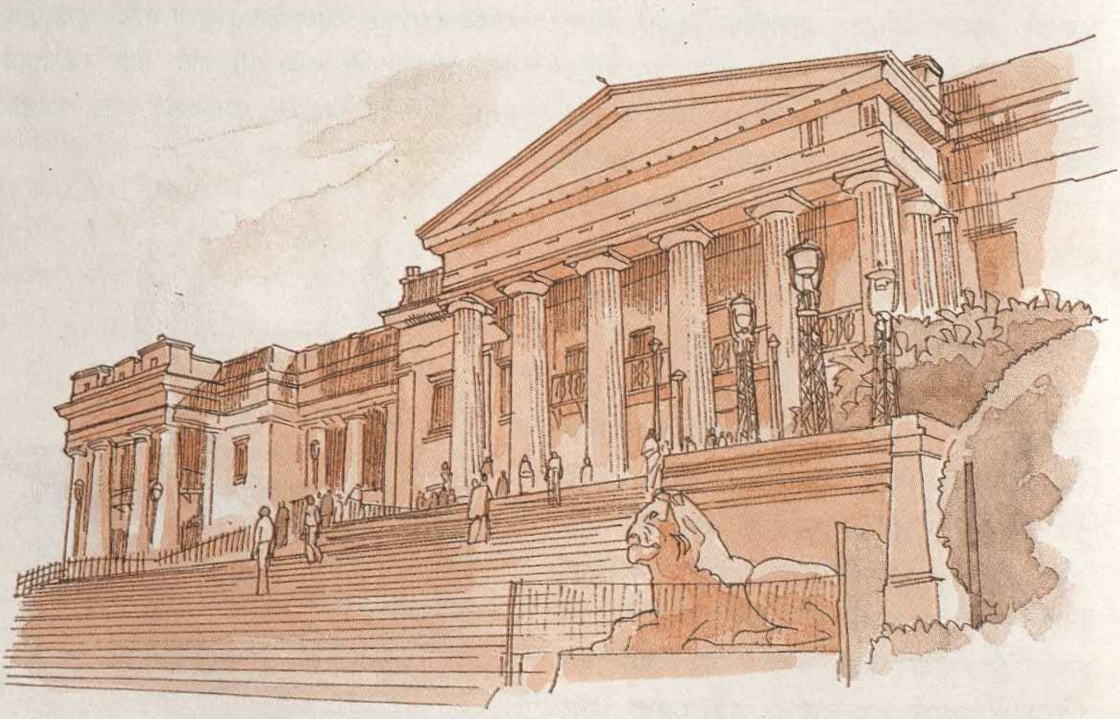
সাগরদিঘি প্রভৃতি থানার মধ্যে দিয়ে এদের গতিপথ। পুরোনো আমলে নলহাটি-আজিমগঞ্জ রাজ্য রেলপথের ৪" গেজের লাইনে রেল চলাচল শুরু হয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর। বারহাড়োয়া-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া সেকশনের রেলপথ এই জেলার মধ্যে ১৩৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে।

জেলায় ৯৬ শতাংশের বেশি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। এমনকী আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ অঞ্চলের দ্বিভাষী মাড়োয়ারি যাঁরা এই জেলায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বসবাস করছেন, তাঁরা তাঁদের প্রথম ভাষা বাংলা বলে দাবি করেন। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উর্দুভাষীদের সমাবেশ দেখা যায় ফরাক্কা ও সুতি থানা অঞ্চলে।

পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জেলাতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় এই হিসাবটা উলটো। অর্থাৎ মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যার থেকে অনেক বেশি। ১৯০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই হিসাবের ব্যতিক্রম হয়নি।

এই জেলায় একটি উপপীঠ আছে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ডাহাপাড়ার কাছে কিরীটকণা গ্রামে কিরীটেশ্বরীর বাস্তু এই উপপীঠ। এখানে সতীর কিরীটের (মাথার মুকুটের) অংশ পড়েছিল। এটি একান্ন পীঠের অন্যতম। লালবাগ খেয়াঘাট পেরিয়ে ডাহাপাড়া ধামের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে এই মন্দিরে। পৌষ মাসে এখানে মেলা হয়।

মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় স্থানগুলির বেশিরভাগ ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে লালবাগ শহরের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে। লালবাগ শহরের কেন্দ্রে ১৮৩৭ সালে নির্মিত নবাব নাজিম হুমায়নজার



হাজারদুয়ারি

প্রাসাদ হাজারদুয়ারি এখন সরকারি পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটি মিউজিয়াম। প্রাসাদে এক হাজারের বেশি দরজা রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে কাটরা মসজিদ, তোপখানা, জগৎ শেঠের বাড়ি, মতিঝিল, রাধামাধবের মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে আছে খোসবাগ, রোশনিবাগ ও অন্যান্য আরও অনেক আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক জায়গা। খোসবাগে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ও তাঁর বেগম লুতফার সমাধি রয়েছে। মালদহ জেলার আদিনা মসজিদ ছাড়া কাটরা মসজিদের মতো এত বড়ো মসজিদ পশ্চিমবঙ্গে আর নেই। এই মসজিদের সিঁড়ির নীচে ধর্মপ্রাণ দর্শনার্থীদের পদধূলিপ্রার্থী হয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ সমাহিত আছেন তাঁর সমাধির মধ্যে। তোপখানায় রক্ষিত কামানটির (জাহানকোষা = জগজ্জয়ী) ওজন প্রায় ৮ টন। এর দৈর্ঘ্য ও বেড় যথাক্রমে ৫.৩৫ ও ১.৩৫ মিটার। একবার তোপ দাগতে ৩০ কেজি বারুদ দরকার হত। কামানটি ঢাকার প্রখ্যাত বাঙালি কারিগর জনার্দন কর্মকার বানিয়েছিলেন ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে।

আজিমগঞ্জ-নলহাটি রেলপথে আজিমগঞ্জ থেকে ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে সাগরদিঘি স্টেশন। এখানে সাগরসদৃশ জলাশয় সাগরদিঘি একটি বিশিষ্ট পুরাকীর্তি। এটি পুব-পশ্চিমে ১১/২ ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১ কিলোমিটার বিস্তৃত। নানা প্রমাণ সাপেক্ষে দিঘিটি পাল সম্রাট মহিপালদেবের (আনুমানিক ৯৮৮-১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ) কীর্তি বলে অনুমান। আজিমগঞ্জের কাছে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বড়নগর গ্রামে নাটোরের রানি ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরের মধ্যে 'চার বাংলা' ও 'ভবানীশ্বর' মন্দির উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত এই মন্দিরগুলির স্থাপত্যের বিশিষ্ট প্রকরণকে বিশেষজ্ঞরা 'মুর্শিদাবাদ রীতি' বলে অভিহিত করেছেন।

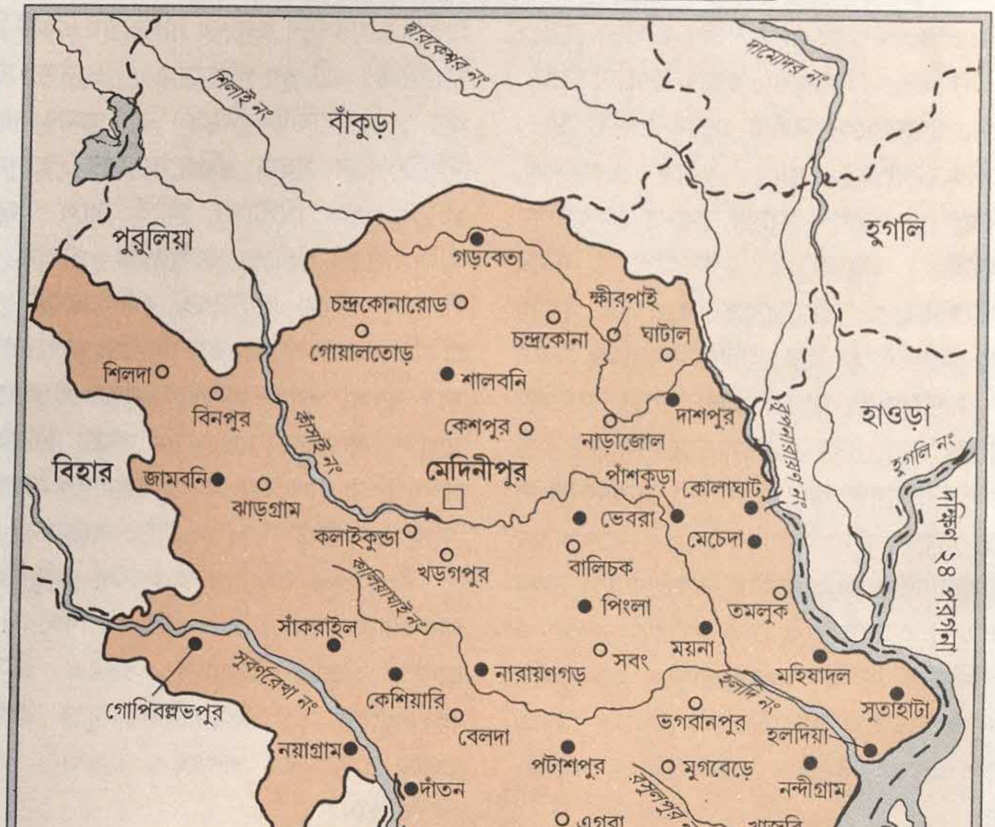
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বাড়িটিও কম আকর্ষণীয় নয়। এটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে তৈরি হয়েছিল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। বহরমপুরের ১১ কিলোমিটার দূরে রাঙামাটি। এখানে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ দর্শনীয় স্থান।

এক নজরে মুর্শিদাবাদ

আয়তন : ৫৩২৪ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৮৯০/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ০.১৫ শতাংশ
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৭৮.৮২ শতাংশ
কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৯৮.৭৭ শতাংশ
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ১৭৮১টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ১৩টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৫৭.৯৪ (১৯৯১)
সাক্ষরতা : ৩৮.২৮ শতাংশ (১৯৯১)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : ১১০০ কিলোমিটার
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : ৮৪ কিলোমিটার
মহকুমার সংখ্যা : ৪ (১৯৯৬) বহরমপুর সদর, লালবাগ, জঙ্গিপুর ও কান্দি
থানার সংখ্যা : ২৫ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : আর্থিক সমীক্ষা ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Murshidabad, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

মেদিনীপুর



পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত এক প্রাচীন পুঁথি অনুসারে ওড়িশার রাজা প্রাণকরের পুত্র মেদিনীকরের নাম থেকে এই জেলার নামকরণ। এই মেদিনীকরই বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান 'মেদিনীকোষ' রচনা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় তেরো শতকে তাঁরই হাতে মেদিনীপুর শহরের প্রতিষ্ঠা বলে জনশ্রুতি।

প্রাচীন রাঢ়া বা রাঢ় জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল মেদিনীপুর। প্রবাদপ্রতিম তাম্রলিপ্ত বন্দর রূপনারায়ণের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সঙ্গে সারা পৃথিবীর বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘটেছিল এই বন্দরের মধ্য দিয়ে। যুধিষ্ঠির জানা তাঁর 'বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস' গ্রন্থে এই

ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। মহাভারতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে—তাম্রলিপ্তের রাজা দ্রৌপদির স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফা-হিয়েন (ভ্রমণকাল ৩৯৯-৪১৪ খ্রিস্টাব্দ) দু-বছর তাম্রলিপ্তিতে থাকেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে তিনি গিয়েছিলেন সিংহলে। এরপর এখানে আসেন হিউয়েন সাঙ (ভারতে অবস্থানকাল : ৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ)। এঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুসারে সমগ্র মেদিনীপুর জেলাই তাম্রলিপ্তি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান তমলুকের কাছাকাছি বা তমলুকই ছিল এর রাজধানী। সপ্তম শতকে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক মেদিনীপুরের দণ্ডভুক্তি (আধুনিক দাঁতন), উৎকল ও গঞ্জাম জেলার কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। অষ্টম



দিঘার সমুদ্র সৈকত

শতকের পর থেকেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন ঘটতে থাকে। দ্বাদশ শতকের শুরু থেকে মেদিনীপুরের অধিকাংশ স্থান উৎকলের রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গদেবের অধীনে ছিল। পনেরো শতকের শেষদিকে গৌড়াধিপতি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ওড়িশা আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় সব দেবমূর্তি বিনষ্ট হয়। শুধু জগন্নাথ মূর্তিকে চিল্কা হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে সেটি রক্ষা পায়। মুঘল বিজয়ের পর মেদিনীপুর সুবা ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে আসে মেদিনীপুর। কোম্পানির অত্যাচারে মেদিনীপুর তথা বাংলার মানুষের নাভিশ্বাস উঠল। চারিদিকে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দ) মন্বন্তর দেখা দিল। সারা দেশ জুড়ে প্রায় ১ কোটি মানুষ অনাহারে ও অসুখে মারা গেল। চাষের জমিতে গজিয়ে উঠল জঙ্গল। এসময়ের অব্যবহিত পরের (১৭৯৯) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই জেলার চুয়াড় বা পাইক বিদ্রোহ। কোম্পানির রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের জমিদার রানি শিরোমণি ও নাড়াজোল রাজপরিবারের চুনিলাল খান এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জমিদারদের বাগদি, মাঝি, লোধা, ভঞ্জ প্রভৃতি উপজাতিভুক্ত পাইক বরকন্দাজরাই ছিলেন এই বিদ্রোহের মূল অংশগ্রহণকারী।

পরবর্তীকালে গোটা ইংরেজ রাজত্বকাল জুড়ে মেদিনীপুর সবসময় ছিল ইংরেজের কাছে একটি সমস্যা। সশস্ত্র এবং সহিংস আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ছিল এই জেলা। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, বয়স নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষ। মেদিনীপুর জেলাস্কুলের প্রধানশিক্ষক রাজনারায়ণ বসু ছিলেন চরমপন্থী কার্যকলাপের

কেন্দ্রবিন্দু। এঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি হয় গুপ্ত সমিতি। ক্ষুদিরাম বসু এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অন্যদিকে হেমচন্দ্র কানুনগোর অস্ত্রশিষ্য। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারার জন্য গুপ্ত সমিতি ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে নিযুক্ত করে। এই অভিযান ব্যর্থ হয়। ক্ষুধিরাম ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করেন, প্রফুল্ল চাকী করেন আত্মহত্যা। মেদিনীপুরের তরুণ বিপ্লবীদের হাতে পরপর তিন বছর তিনটি জেলাশাসক পেডি, ডগলাস এবং বার্জের মৃত্যু হয়। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে তমলুকে থানা আক্রমণকালে সত্তর বছর বয়সের মাতঙ্গিণী হাজরা গুলিবিদ্ধ হয়ে মরার আগেও জাতীয় পতাকা তুলে ধরতে ভোলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলন এই জেলায় এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, কাঁথি ও তমলুক মহকুমার বিরাট অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় সমান্তরাল (জাতীয়)



বর্গভীমা মন্দির

সরকার। তমলুকের জাতীয় সরকার প্রায় দু-বছর স্থায়ী হয়। ভারতের তিন রঙের জাতীয় পতাকার নকশা এই জেলারই সৃষ্টি। উদ্ভাবক ছিলেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হেমচন্দ্র কানুনগো।



কর্ণগড় চপলেশ্বর মন্দির

বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা। এই জেলার উত্তরে বাঁকুড়া, উত্তর-পশ্চিমে পুরুলিয়া, পূর্বে হুগলি জেলা ও রূপনারায়ণ নদী এবং পশ্চিমে ওড়িশা ও বিহার রাজ্য।

মেদিনীপুর ও খড়গপুর শহরের মধ্য দিয়ে যে রাজ্য সড়কটি (রানিগঞ্জ, বাঁকুড়া ছুঁয়ে) উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে তাকে এই জেলার প্রাকৃতিক বিভাজন রেখা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এর পূর্বদিকে পলিগঠিত, অত্যন্ত উর্বর সমভূমি এবং পশ্চিমে ছোটোনাগপুর মালভূমির প্রান্তভাগ ও ঢেউখেলানো সমভূমি বা রাঢ় অঞ্চল। জেলার

পশ্চিমাংশ শুষ্ক ও ল্যাটেরাইট মাটি দিয়ে গঠিত। কোনো কোনো স্থানে ১০০০ ফুট বা তার বেশি উঁচু ছোটো ছোটো পাহাড় আছে। বিনপুর, জামবনি, গোপীবল্লভপুর, দাঁতন প্রভৃতি থানার অধিকাংশ এলাকা এই প্রাকৃতিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। চন্দ্রকোণা, মহিষাদল, পটাশপুর, এগরা প্রভৃতি থানার সম্পূর্ণ অংশ এবং মেদিনীপুর, খড়গপুর, গড়বেতা, তমলুক, ডেবরা প্রভৃতি থানার কিয়দংশ সমভূমির অন্তর্গত। এ ছাড়াও আছে এই জেলার বিস্তৃত এক উপকূলভাগ। জেলার নদীগুলির মধ্যে কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, শিলাবতী, হলদি, রূপনারায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রূপনারায়ণ নদী কোলাঘাট থেকে সমুদ্রকূল পর্যন্ত সারা বছর নৌবহনযোগ্য থাকে। এত নদীনালা থাকা সত্ত্বেও জেলার কৃষিকাজ প্রধানত বৃষ্টিনির্ভর। ধান জেলার প্রধান ফসল। আমন ধানের (হৈমন্তিক) চাষই বেশি হয়। সেচের অভাবে বোরো বা গ্রীষ্মকালীন ধানের চাষ যথেষ্ট ব্যহত হয়। সরষে বা রাইসরষের চাষ এই জেলার বৈশিষ্ট্য। কালো রঙের কাদা মাটিতে পান চাষ হয়। পান এই জেলার একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল।

জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশের পাহাড়ি অঞ্চলে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল দেখা যায়। আগে এইসব বনভূমি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গ অরণ্য আইন, ১৯৪৮ অনুসারে এই বনাঞ্চল সরকারি কর্তৃত্বাধীনে আসে। শালের খুঁটি, জ্বালানি কাঠ, বিড়ির পাতা, কাজুবাদাম ইত্যাদি থেকে বছরে প্রচুর আয় হয়।

বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহারের জন্য লাল কাঁকুরে পাথর খনি থেকে পাওয়া যায়। এই পাথর শক্ত ও মজবুত। জেলার অসংখ্য পুরোনো দেউল, মন্দির, মসজিদ ও গড় এই পাথরে তৈরি। খনিজ সম্পদ বলতে এই জেলায় তেমন আর কিছু নেই।

খড়গপুর, হলদিয়া ও ঝাড়গ্রামের শহরাঞ্চলের আশেপাশে বড়ো ও মাঝারি শিল্পের অবস্থিতি। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের লোকো, ক্যারেজ ও ওয়াগন কারখানা রয়েছে খড়গপুরে। হলদিয়া হয়ে উঠেছে বন্দর নগরী। হুগলি নদীর নাব্যতার অভাবে কলকাতা বন্দরে যে বড়ো বড়ো জাহাজগুলি পৌঁছোতে পারে না সেগুলি হলদিয়া বন্দরে নোঙর করে। মধ্য-পূর্ব এশিয়া থেকে আমদানিকৃত অশোধিত খনিজ তেল শোধনের জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন হলদিয়ায় একটি তৈল শোধনাগার নির্মাণ করেছে। একে ঘিরেই জেগে উঠেছে হলদিয়ায় এক ব্যাপক শিল্প সম্ভাবনা। শোধনাগার সংলগ্ন ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার একটি সার কারখানা আছে। তাঁতশিল্প জেলার প্রাচীন শিল্প। কৃষির পরেই বেশিরভাগ মানুষ এই শিল্পে নিযুক্ত। গোপীবল্লভপুর ও আনন্দপুর (রেশম সুতোর কাজ), রামজীবনপুর, কেশপুর ও অমর্ষি (তাঁতের শাড়ি) এবং তমলুক (পলিয়েস্টার শার্টিং) তাঁত শিল্পের প্রধান এলাকা। মেদিনীপুরের মাদুর বিখ্যাত। এই শিল্প সবং এবং রামনগর থানায় দেখা যায়।

খড়গপুর জেলার সবচেয়ে বড়ো শহর। উনিশ শতকের শুরুতে যখন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এই শহরের পত্তন হয় তখনই এর গড়ে ওঠার সূচনা। ১৯৫০ সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি স্থাপিত হবার পর শহরটি আরও সম্প্রসারিত হয় এবং প্রকৃত অর্থে কসমোপলিটান হয়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কর্মসূত্রে আগত মানুষের ভিড় এই শহরে। জওহরলাল নেহেরু তাই খড়গপুরকে বলেছিলেন 'মিনিয়েচার ইন্ডিয়া'। জাতীয় সড়ক বোম্বে হাইওয়ে তৈরি হওয়ার পর এই শহরের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। এই শহরেই জেলার শতকরা ৪১ ভাগ শহুরে জনসংখ্যার বাস। মেদিনীপুরে এই সংখ্যা শতকরা



একদা হিজলী বন্দীশিবির এখন IIT-র অংশ

১৫ ভাগ। অন্যান্য শহরে আরও কম। পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্মটি খড়গপুরে অবস্থিত। শহরের অদূরে কলাইকুন্ডাতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বন্দর আছে।

মেদিনীপুর শহরের পশ্চিমদিকের মাটি লাল, পাথুরে, পূর্বদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রগুলি। শহরে যে জোড়া মসজিদটি আছে সেটি চারশো বছরের পুরোনো বলে কথিত। প্রতি বছর উরস উৎসবে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধর্মার্থীরা যোগ দিতে আসেন। মেদিনীপুরের ৩২ মাইল উত্তরে গড়বেতা একটি পুরোনো শহর। এটি জেলার অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে প্রাচীন বগড়ি রাজাদের রাজধানী ছিল। এখনও সেই সময়কার মন্দির, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও বড়ো বড়ো পুকুর আছে। কাঁথি মহকুমা মাছ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। মহকুমার প্রায় ১০ শতাংশ অধিবাসী এখানকার মৎস্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দিঘা সমুদ্র উপকূলের একটি পর্যটন কেন্দ্র কাঁথি মহকুমায় অবস্থিত। বছরে দীঘায় প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি পর্যটক বেড়াতে আসেন। কলকাতা থেকে দিঘার দূরত্ব ১৮৭ কিলোমিটার। দিঘার কাছে নিউ দিঘাতে পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য রয়েছে অমরাবতী লেক, মেরিন অ্যাকুয়ারিয়াম আর সর্পোদ্যান। ঘাটাল মহকুমায় চন্দ্রকোণা একটি প্রাচীন শহর। এখানে রাজপুত রাজা চন্দ্রকেতুর আমলের সৌধ ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। এখানকার মাটি বাড়ি তৈরির জন্য খুবই উপযুক্ত। এই ধরনের মাটিতে তৈরি বড়ো বড়ো দোতলা বাড়ি এখানে অনেক দেখা যায়। এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধি পুরোনো প্রবাদের মধ্যে এখনও প্রাণবন্ত : 'বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি, তবে জানবি চন্দ্রকোণা এলি।'

এই জেলায় কৈবর্তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। জেলার

বিশিষ্ট চাষি এরাই। মাছ ধরা ও নৌকা চালানোও অনেকের পেশা। এরা জনগোষ্ঠী হিসেবে খুবই প্রাচীন। সম্ভবত এরাই ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের শাসক। কেশপুর থানা এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতালরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিনপুর, শিলদা, শালবনি ও গড়বেতায় এদের বসবাস।

জেলার বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা নব্বই জন। খড়গপুর টাউন থানায় এই সংখ্যা মাত্র শতকরা ৩৫। অন্যান্য ভাষাভাষীদের মধ্যে যারা এই থানায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে তারা তেলুগু।

বাংলা গদ্যের শুরু যাঁদের হাত ধরে সেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) ও বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার আরও কৃতীসন্তান যাঁদের নাম কোনো না কোনোভাবে এই জেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁরা হলেন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরি, জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম স্কুল জীবন শুরু হয় এই জেলায়। পরে যখন কাঁথি মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এখানে তিনি আবার এলেন তখনই তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের পরিকল্পনা রচিত হয়। এই উপন্যাসে কাঁথির দুটি গ্রাম ও রসুলপুর নদী চিত্রিত হয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়াজোল রাজবাড়িতে দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষক ছিলেন। কবি জীবনানন্দ দাশ খড়গপুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

ভীমপূজা জেলার বিশিষ্ট লোকউৎসব। সময়, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি। মেদিনীপুর-বাঁকুড়া সীমান্তে গড়বেতা সংলগ্ন গণগণির ডাঙায় ভীম ও বকরাক্ষসের যুদ্ধ হয়েছিল বলে জনশ্রুতি। এই জেলায় শীতলার আধিপত্য সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া আছে চৈত্র-বৈশাখে গাজন উৎসব, ধর্মপূজা, দোলের আগের দিন অনুষ্ঠিত চাঁচর উৎসব ইত্যাদি।

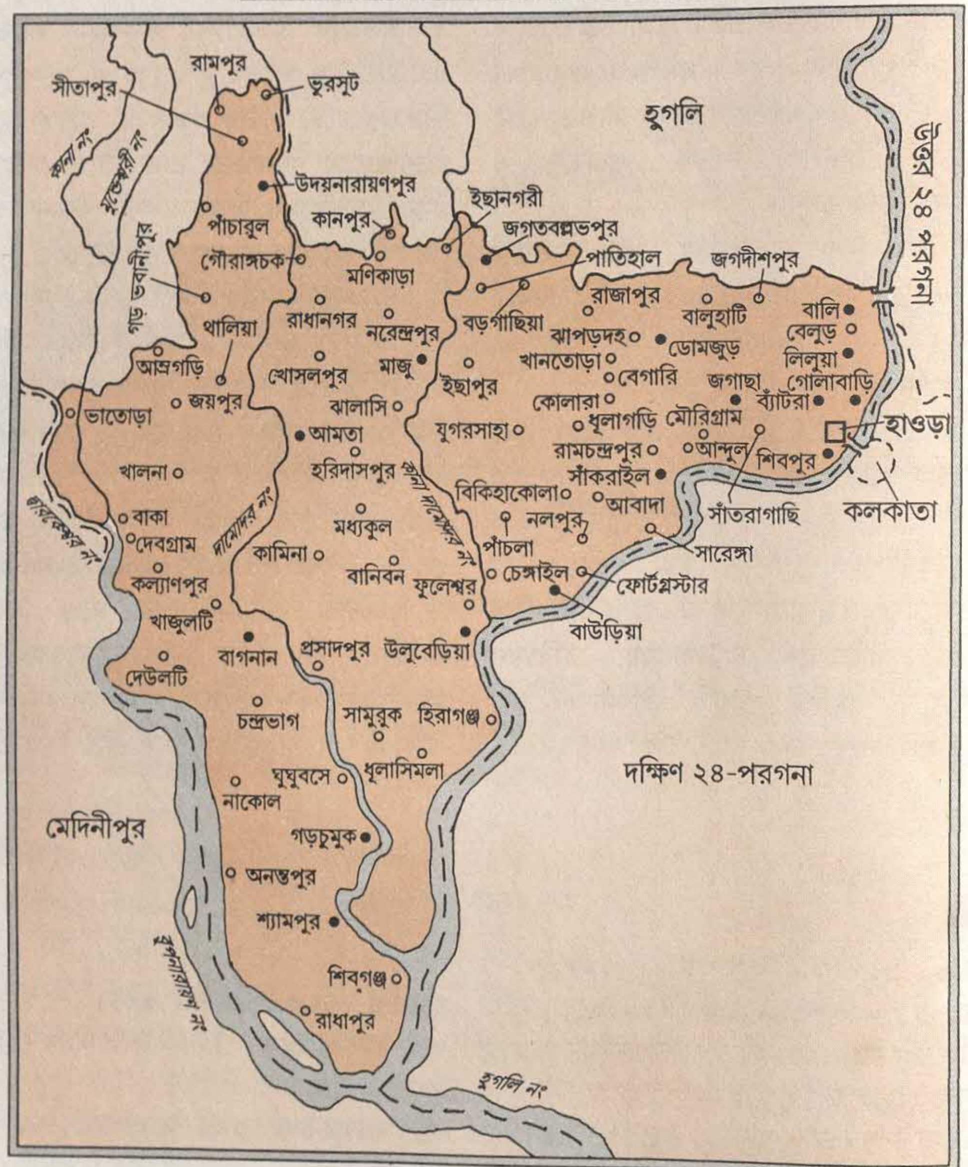
জেলার পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে তমলুকের বর্গভীমা দেবীর মন্দির, কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির, গড়বেতা, গগনেশ্বর ও নয়াগ্রামের পাথরের দুর্গ, দাঁতনের শরশঙ্ক দিঘি উল্লেখযোগ্য।

এক নজরে মেদিনীপুর

আয়তন : ১৪,০৮১ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ৮৩ লক্ষ ৩২ হাজার (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ৫৯২/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ১২.৫৬ শতাংশ
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৬৫.৪৫ শতাংশ
কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৯৭.৬৭ শতাংশ
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ৫১৬৬টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ১৯টি (মার্চ ৩১, ১৯৯৪)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৫৮.৩৯ (১৯৯১)
সাক্ষরতা : ৬৯.৩২ শতাংশ (১৯৯১)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : ১৮৭০ কিলোমিটার (১৯৯৪ পি. ডব্লু. রাস্তা)
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : ১৪৭ কিলোমিটার (১৯৯৪ পি. ডব্লু. রাস্তা)
মহকুমার সংখ্যা : ৬ (১৯৯৬) মেদিনীপুর সদর, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম ও হলদিয়া।
থানার সংখ্যা : ৪৬ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা* ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Medinipur, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

হাওড়া



প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতার নিরিখে পুরোপুরি স্বতন্ত্র একটি জেলা হিসাবে হাওড়ার আত্মপ্রকাশ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে হাওড়ার জন্য মাসিক ৯০০ টাকা বেতনের ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করার আগে পর্যন্ত জেলাটি ছিল হুগলি জেলার সঙ্গে যুক্ত। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান বিভাগ থেকে বার করে নিয়ে হাওড়াকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আজকের হাওড়া শহরের কাছাকাছি হাড়িড়া নামের অখ্যাত একটি গ্রাম থেকে হাওড়া নামের

জন্ম। এই গ্রামটির অস্তিত্ব ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে। মানুষের মখে মুখে হাড়িড়া অপভ্রংশ হয়ে হাওড়া হয়েছে।

প্রাচীন জৈন, বৌদ্ধ বা হিন্দু সাহিত্যে কিংবা গ্রিক এবং চৈনিক পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে হাওড়া অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অনেক পণ্ডিতের মতে প্রাচীনকালে সুহ্ম ছিল রাঢ়ের অংশ বিশেষ এবং এই সুহ্মের দক্ষিণাংশ ছিল আধুনিক হাওড়া ও মেদিনীপুর নিয়ে গঠিত।

পূর্ব সীমানায় ভাগীরথী নদী ও পশ্চিম সীমানায় রূপনারায়ণ নদীর দ্বারা পরিবৃত হাওড়া জেলার ভূমিখণ্ড পলিগঠিত ও সমতল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে জমির সামান্য উচ্চতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে জেলার নদীগুলির গতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বমুখী। এই দুটি নদী দামোদর (ভুরসুট দিয়ে এই জেলায় প্রবেশ করে আমতা, বাগনান হয়ে ফলতা পয়েন্টের উলটোদিকে হুগলি নদীতে মিশেছে। জেলায় এর মোট দৈর্ঘ্য ৪৫ মাইল।) এবং এদের শাখানদীগুলি সমগ্র জেলাটিকে নদীর উচ্চ তীরভূমি ও দুই তীরভূমির মধ্যবর্তী বিস্তৃত জলা বা নিম্নভূমিতে বিভক্ত করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ডানকুনি ও হাওড়া জলার কথা বলা যেতে পারে। এদের অবস্থান ভাগীরথীসৃষ্ট উচ্চভূমির পশ্চিম পাড় ও সরস্বতীসৃষ্ট উচ্চভূমির মাঝখানে। এইভাবে রাজপুর জলা সরস্বতী ও কানা দামোদর ও আমতা জলা কানা দামোদর এবং দামোদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। মাকড়দহ ও বড়াগাছিয়ার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল খুব নিচু। কোলাঘাট থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চলে আবার অন্য দৃশ্য। এখানে নদীগুলি প্রশস্ত ও বেগবতী। এদের স্রোত রুখতে দু-পাড় বাঁধতে হয়েছে, পাছে তীরবর্তী অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জেলাটির বৃহত্তর অংশ সাগরাঙ্ক থেকে ১৫-২০ ফিটের বেশি উঁচু নয়। যেমন হাওড়া ময়দানের কাছাকাছি অঞ্চলের এই উচ্চতা ২০ ফিট এবং বোটানিকাল গার্ডেন অঞ্চলে ১৫ ফিট।

জেলার প্রধান নদীগুলি হল ভাগীরথী ও তার উপনদী সরস্বতী, দামোদর ও তার দুই শাখা নদী কানা দামোদর (বা কৌশিকি) এবং পুরোনো দামোদর ও রূপনারায়ণ। এ ছাড়াও আছে অজস্র খাল ও খাড়ি সারা জেলায় ছড়িয়ে। পূর্বাংশে ভাগীরথী, কেন্দ্রে দামোদর এবং পশ্চিমাংশে রূপনারায়ণ জেলায় সেচের জন্য জলের প্রধান উৎস। আমতা, জগতবল্লভপুর ও ডোমজুড় থানা অঞ্চলে ডিভিসি নিয়ন্ত্রণাধীন খালের সাহায্যে জমিতে জলসেচ করা হয়। জেলার প্রধান কৃষিফসল ধান। এর মধ্যে আমন ধানের চাষ সর্বাধিক। খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পর ডালই প্রধান কৃষিফসল। ছোলা, মুগ, মুসুরি, খেসারি প্রভৃতি চাষ করা হয়। পাট জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎশিল্পে হাওড়া জেলা বিখ্যাত। জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কেন্দ্র হিসাবে সালকিয়া অঞ্চল, যেখানে এই শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সুদূর ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে, আজও গুরুত্বপূর্ণ। এই শিল্প হুগলি নদীর পশ্চিম পাড়ে বালি থেকে নাজিরগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। হাওড়ার জাহাজ তৈরি ও মেরামত শিল্প ভারতে বৃহত্তম। হুগলি ডকিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (সালকিয়া), সালিমার ওয়ার্কস (শিবপুর), পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (নাজিরগঞ্জ, বোটানিকাল গার্ডেনের কাছে) ইত্যাদি সহ এইরকম বৃহৎ কারখানার সংখ্যা চোদ্দো। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম জুটমিল স্থাপিত হয় এই জেলার ফোর্ট গ্লোস্টারে (বাউড়িয়া থানা অঞ্চলে)। এখন এর সংখ্যা প্রায় কুড়ি। ভারতের প্রথম কটন মিল (বাউড়িয়া কটন মিল) স্থাপিত হয় এই জেলায় ১৮১৭ (বা ১৮২২) খ্রিস্টাব্দে। কটন মিলের সংখ্যা বেড়ে পরবর্তীকালে প্রায় চল্লিশে পৌঁছোয়। এ ছাড়া

আছে শিবপুরের দড়া তৈরির কারখানা গ্যাঞ্জেস রোপ কোম্পানি, সালিমার পেইন্টস, লিলুয়ার ইস্টার্ন রেলওয়ে ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ ইত্যাদি। জেলার বৃহৎশিল্প প্রসারের জন্য শুরুতে যে কারণগুলি সহায়ক হিসাবে কাজ করেছিল তাদের মধ্যে ১৮৫৪ সাল থেকে হাওড়ার গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের টারমিনাস হয়ে ওঠা, ১৮৬২ সালে মোগলসরাই পর্যন্ত এই রেলপথের প্রসার, ১৮৭৪ সালে হাওড়া পন্টুন ব্রিজের উদ্বোধন ইত্যাদি অন্যতম।

ছোটো ছোটো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি বেশিরভাগ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উত্তর পাড়ে ভিড় করে গড়ে উঠেছে। মেশিনশপগুলি ভিড় করেছে বেলিলিয়াস রোডের উপর। পাঁচলা থানা এলাকায় তৈরি হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যবহারের জন্য পরচুল, দেউলপুরে পোলো খেলার বল। ফুটবল ও শাট্‌লকক তৈরি হয় উলুবেড়িয়া থানার বানিবন গ্রামে, তালা-চাবি তৈরি হয় পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুড় থানার প্রায় ঘরে ঘরে। রাজ্য সরকারের সেন্ট্রাল লক ফ্যাক্টরি আছে বড়াগাছিয়াতে (জগৎবল্লভপুর)।

পূর্ব রেলপথের হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগ এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের খড়গপুর বিভাগ এই জেলায় রেল চালায়। পূর্ব রেলপথের হাওড়া টারমিনাস ছাড়া লিলুয়া, বেলুড়, বেলানগর ইত্যাদি স্টেশন রয়েছে এই জেলায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের আছে রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, মৌরিগ্রাম, আন্দুল প্রভৃতি। এই দুই রেলপথের মিলনস্থল হল টিকিয়াপাড়া। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ও আন্দুল রোড হাওড়া শহরের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার দুটি গুরত্বপূর্ণ রাস্তা। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে দুর্গাপুরের সঙ্গে ডানকুনি ও বালিকে যুক্ত করে পলসিতের কাছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের সমান্তরালে প্রসারিত। এ ছাড়া ২নং জাতীয় সড়কের বাইপাস (দিল্লি রোড) এই জেলার মধ্য দিয়ে ৪০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছে। বোম্বে-মাদ্রাজ জাতীয় সড়ক ৫ ও ৬নং এই জেলার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত।



মাকড়চণ্ডী মন্দির



বেলুড়মঠ

হাওড়া শহর কলকাতা শহরের মতো কর্পোরেশন আখ্যায় ভূষিত হয়েছে জুলাই ২৪, ১৯৬৫ থেকে। কলকাতা ও হাওড়া জেলার সংযোগকারী সবচেয়ে জনপ্রিয় সেতুটি হল ভাগীরথীর উপর ক্যান্টিলিভার ব্রিজ (হাওড়া ব্রিজ); এখন এর নাম রবীন্দ্রসেতু। এই শহরের সবচেয়ে পুরোনো অঞ্চল হল বেতর। বেতরের বেতাইচণ্ডীর উল্লেখ আছে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের (১৪১৭-১৪৯৫) 'মঙ্গলচন্ডী' (খ্রিস্টাব্দ ১৪৯৫) কাব্যে। ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত বেতর সম্ভবত সপ্তগ্রাম বন্দরের বিকল্প হিসাবে গড়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 'মঙ্গলা-হাট'। হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরের তাঁতিদের অনুরোধে আন্দুলের মল্লিক পরিবার এই হাট প্রতিষ্ঠা করে। সেই সময় জায়গাটির নাম ছিল চড়কডাঙা। হাওড়া ময়দান ও গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব দিকে অবস্থিত চড়কডাঙার এই মঙ্গলা-হাটকে ঘিরেই হাওড়ার আজকের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি বিকশিত হয়েছে।

জেলার বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৮৫ শতাংশ), তারপর হিন্দিভাষী (প্রায় ৯ শতাংশ) এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে উর্দুভাষী মানুষের সংখ্যা (৪ শতাংশ)। এ ছাড়াও রয়েছে জেলার শিল্পাঞ্চলে কাজ করতে আসা বিভিন্ন প্রদেশের নানা ভাষাভাষীর মানুষ।

এই জেলায় দেবী চণ্ডীর প্রাচুর্য দেখা যায়। জেলার উত্তর ভাগে বিভিন্ন গ্রামে লৌকিক দেবী হিসাবে চণ্ডীর পূজা হয়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের

মতে চণ্ডী শব্দটি অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষাজাত। হাওড়া জেলার মতো আর কোনো জেলায় এত রকমের চণ্ডী দেখা যায় না। যেমন, কল্যাণচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, মাকালচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী ইত্যাদি। এই জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় চণ্ডীরা হলেন আমতার মেলাইচণ্ডী, মাকড়দহের মাকড়চণ্ডী এবং কাসুন্দিয়ার ওলাইচণ্ডী, আমতার মেলাইচণ্ডীর মন্দির বাহান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে সতীর হাঁটুর মালাইচাকি পড়েছিল। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুর মঠ প্রতিষ্ঠা জানুয়ারি ১, ১৮৯৯) গঙ্গার পশ্চিম পারে বালি থানা এলাকায় অবস্থিত। দেশের সমস্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এটাই প্রধান কার্যালয়। ঘুসুড়িতে (হাওড়া শহরের মধ্যে) একটি তিব্বতি মন্দির আছে। তিব্বতিদের জন্য জায়গাটার নাম হয়েছে ভোটবাগান। পুরন গিরি নামে এক দশনমি সন্ন্যাসীর দ্বারা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তিব্বতি লামা ধর্ম এবং দশনমিদের শৈব ধর্মের সমন্বয়ের প্রতীক হিসাবে মন্দিরটি চিহ্নিত।

উলুবেড়িয়ার রাসমেলা, ফোর্ট গ্লোস্টারের দুর্গা পূজা মেলা, কল্যাণপুর, বানিবন, বাগনান এবং আম্রগড়ির গাজন মেলা ইত্যাদিতে প্রচুর জনসমাগম হয়।

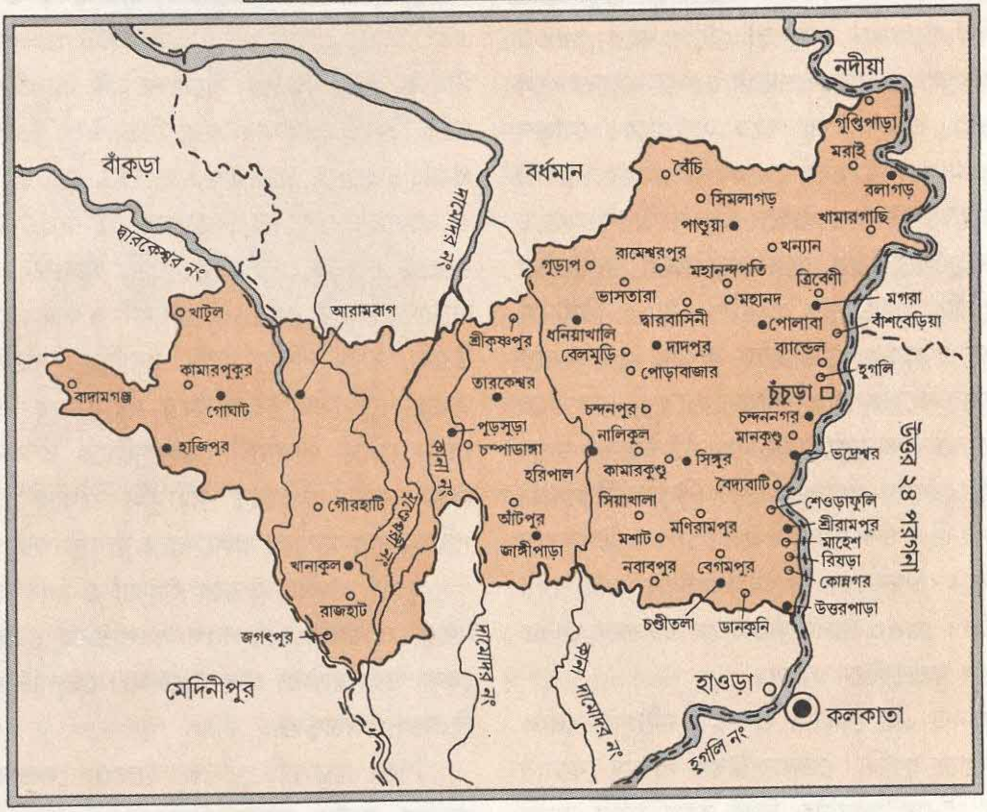
এই জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত গাদিয়াড়া গ্রামে রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে পুরোনো রাইস মিলের বিলাসবহুল অফিস বাড়িটি পর্যটন আবাসে পর্যবসিত হয়েছে। এই থানা অঞ্চলেরই আর একটি গ্রাম গড়চুমুক। স্থানটি দর্শনীয় বলে খ্যাতি আছে। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে দামোদর। এখানে দামোদর প্রবাহের শেষ অংশে এশিয়ার বৃহত্তম স্লুইশ গেট তৈরি করা হয়েছে দামোদর নদ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে। এই স্লুইশ গেটের দক্ষিণ-অংশে জেলা পরিষদের তরফ থেকে বন সৃজন করা হয়েছে। এর মধ্যে হরিণ প্রকল্প, শিশু উদ্যান, ভ্রমণ স্থল, পিকনিক করার খোলা মাঠ, নদীর বুকে নৌকা বিহার ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। উলুবেড়িয়া স্টেশন বা তার আগের স্টেশন ফুলেশ্বর থেকে গড়চুমুকে যাওয়া যায়।

এক নজরে হাওড়া

আয়তন : ১৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ৩৭৩০ হাজার (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ২৫৪৩/বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৬৬.০৭ শতাংশ (১৯৮২-৮৩-র থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কর্ষিত জমি : (মোট চাষযোগ্য জমির) ৯৫.৯১ শতাংশ (১৯৮২-৮৩-র থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ২৫.০২ (১৯৯১)
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ৭৫৫টি (১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ৩৫টি (১৯৯৪)
সাক্ষরতা : ৬৭.৬২ শতাংশ (১৯৯১)।
হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ১৯৫ (১৯৯৪)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : ৫৪০ কিলোমিটার (১৯৯৪)
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : —
মহকুমার সংখ্যা : ২ (১৯৯৬) হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া
থানার সংখ্যা : ১৯ (১৯৯৬) ·

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা* ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Howrah, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

হুগলি



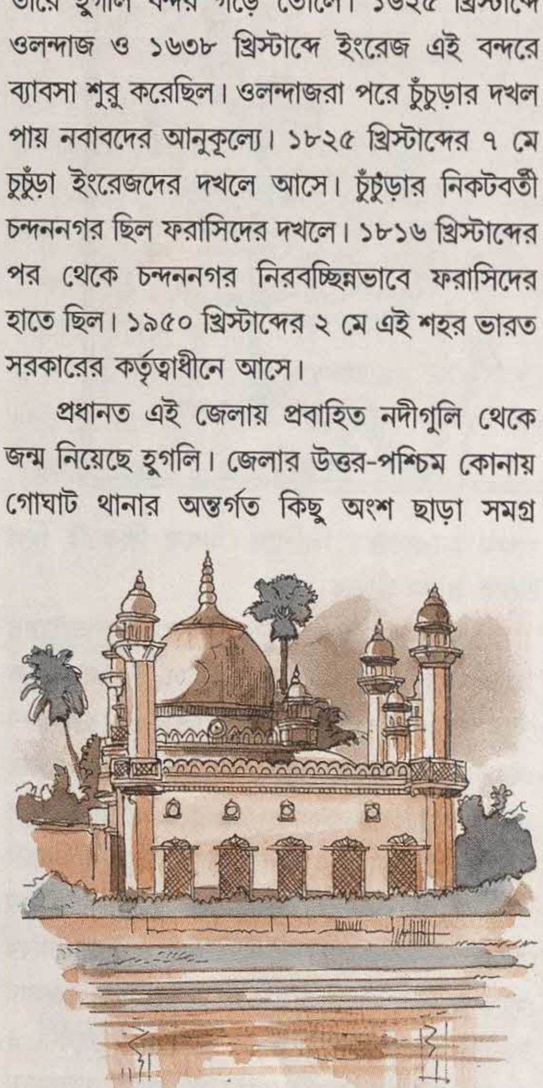
বর্ধমানের দক্ষিণাংশকে বিচ্ছিন্ন করে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে হুগলি জেলা তৈরি করেছিল। হাওড়া তখনও এই জেলার মধ্যেই রয়েছে। জেলা বলতে কতগুলি থানার সমষ্টি। মহকুমার ধারণা তখনও জন্ম নেয়নি। এই জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে হাওড়া স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে দেখা দিয়েছিল ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি। ১৮৭২ সালের ১৭ জুন চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল থানা মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়।

প্রাচীনকালে সুহ্ম বা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল হুগলি জেলা। নদী, খাল, বিল অধ্যুষিত এই অঞ্চল ছিল কৈবর্ত ও বাগদিদের আবাসস্থল। এদের উল্লেখ রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা এবং পঞ্চম অশোকস্তম্ভ লিপিতে। মৎস্য শিকারই ছিল এদের প্রধান জীবীকা।

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে হুগলি নামের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় জেলার নামকরণ বিদেশীকৃত নয়। কারণ এই রচনাকালের ২২ বছর পর পর্তুগিজরা বাংলায় প্রবেশ করেছিল। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থেও হুগলি নামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ত্রিবেণীতে অবস্থিত জাফর খাঁর মসজিদ ও তাঁর মাদ্রাসায় উল্লিখিত প্রতিষ্ঠা তারিখ থেকে অনুমান করা যায় ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে জেলার উত্তরাংশ মুসলমান শাসনভুক্ত হয়েছিল। ত্রিবেণী ও পরে সাতগাঁ (সংস্কৃতে সপ্তগ্রাম) ছিল স্থানীয় মুসলমান

শাসকদের সদর কার্যালয়। সাতগাঁয়ে এই সময়কার একটা টাঁকশাল ছিল। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ শাহের দেওয়া সনদের বলে পর্তুগিজরা ব্যাবসা শুরু করে সপ্তগ্রামে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পলি জমে সরস্বতী নদীর নাব্যতা নষ্ট হতে থাকলে এবং ভাগীরথীর খাতে এই প্রবাহ পরিবর্তিত হলে পর্তুগিজরা ভাগীরথীর তীরে হুগলি বন্দর গড়ে তোলে। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ ও ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ এই বন্দরে ব্যাবসা শুরু করেছিল। ওলন্দাজরা পরে চুঁচুড়ার দখল পায় নবাবদের আনুকূল্যে। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে চুঁচুড়া ইংরেজদের দখলে আসে। চুঁচুড়ার নিকটবর্তী চন্দননগর ছিল ফরাসিদের দখলে। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে চন্দননগর নিরবচ্ছিন্নভাবে ফরাসিদের হাতে ছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২ মে এই শহর ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে।

প্রধানত এই জেলায় প্রবাহিত নদীগুলি থেকে জন্ম নিয়েছে হুগলি। জেলার উত্তর-পশ্চিম কোনায় গোঘাট থানার অন্তর্গত কিছু অংশ ছাড়া সমগ্র



ফুরফুরাশরিফ

জেলাটি পলিগঠিত সমভূমি। এটি একটি প্রায় অরণ্যবিহীন জেলা। দামোদর, দ্বারকেশ্বর ও হুগলি এই জেলার প্রধান নদী। হুগলি নদী জেলার পূর্ব সীমানা রচনা করেছে, দামোদর নদী আরামবাগ ও বাকি তিনটি মহকুমার মধ্যে বিভাজিকা তৈরি করে প্রবাহিত হয়েছে, দ্বারকেশ্বর প্রবাহিত হয়েছে গোঘাট ও আরামবাগ থানার বিভাজিকা হিসাবে। এ ছাড়া রয়েছে বেহুলা, সরস্বতী, কুন্তি, মুণ্ডেশ্বরী, কানা দামোদর প্রভৃতি ছোটো ছোটো নদী ও খাল। নদীগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। দামোদরের প্রবাহ পথে বাঁধ তৈরি করে বর্ষায় এর বিধ্বংসী প্লাবন থেকে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। নদীগুলি থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়।

হুগলি জেলার উত্তরে বাঁকুড়া ও বর্ধমান, পূর্বে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলা এবং দক্ষিণে হাওড়া জেলা। জেলাটি বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

শিল্পে জেলাটি উন্নত হলেও জেলার ৫০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। সমগ্র আরামবাগ মহকুমা ও জাঙ্গিপাড়া (শ্রীরামপুর মহকুমা), পাণ্ডুয়া (হুগলি মহকুমা), পোলবা (হুগলি মহকুমা), ধনিয়াখালি (হুগলি মহকুমা) ইত্যাদি ব্লকগুলিতে ধান প্রধান কৃষিপণ্য। তারকেশ্বর (চন্দননগর মহকুমা), পুড়শুড়া (আরামবাগ মহকুমা), বলাগড় (হুগলি মহকুমা) ইত্যাদি ব্লকগুলিতে আলু, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষ হয়। জেলায় আমন ধানের চাষ সবচেয়ে বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয় তারকেশ্বরে (১৯৯২-৯৩ সালে ৪৪১.৫৪০ মেট্রিক টন)।

ভারতবর্ষে প্রথম চটকল ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রিষড়ায় (শ্রীরামপুর মহকুমা) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জেলায় বর্তমানে প্রায় ১০টি চটকল আছে।



কামারপুকুরে রামকৃষ্ণদেবের বসতবাড়ি

শ্রীরামপুরে ৪টি সূতাকল (ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন অধিগৃহীত) নানা কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে এশিয়ার বৃহত্তম কারখানা হিন্দুস্থান মোটরস এই জেলায় অবস্থিত। এই জেলার ধনেখালি শাড়ি এখনও হরিপাল, খানাকুল, আরামবাগ প্রভৃতি ব্লকে ছড়িয়ে রয়েছে। ফরাসডাঙার ধুতি (চন্দননগর) অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে কোনোরকমে টিকে আছে। লখনউ চিকনের সমকক্ষ এখানকার 'বাবনানের চিকন' ভারত বিখ্যাত। এই কাজ প্রধানত আমেরিকায় রপ্তানি হয়। পোলবা, দাদপুর, পাণ্ডুয়া, ধনেখালি ও হরিপাল এলাকায় এই শিল্প কেন্দ্রীভূত। জাঙ্গিপাড়ার জরির কাজও উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবেণী রেল স্টেশনের কাছে রয়েছে ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৯৬৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এর প্রথম ইউনিটটি চালু হয়। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, উত্তরপাড়া, বৈদ্যবাটি, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর ও রিষড়ার কিছু অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে।

কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার প্রধান রেল সড়ক জেলার পূর্ব প্রান্ত ধরে শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও ব্যান্ডেল হয়ে চলে গেছে। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনও এই জেলার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত। তারকেশ্বর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে। শেরশাহ (১৫৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দ শাসনকাল) সরস্বতী নদীর বাম তীরে সপ্তগ্রাম থেকে দিল্লি পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন। সপ্তগ্রাম বর্তমানে হুগলি জেলার মগরা থানার অন্তর্গত গ্রাম। জেলার পূর্বাংশের শহর এলাকার ধার দিয়ে চলে গেছে দিল্লি রোড (৬৯ কিলোমিটার এই জেলার মধ্যে)। এই দিল্লি রোডকে জেলার রাস্তাঘাটের মেরুদণ্ড বললে অত্যুক্তি হয় না। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের (২নং জাতীয় সড়ক) প্রশস্ত বাইপাস রাস্তা হিসাবে দিল্লি রোডের সূচনা। আরামবাগ সম্পূর্ণভাবে রেলপথবিহীন একটি মহকুমা।

হুগলির উপভাষা (dialect) সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় বাংলা বা মেট্রোপলিটন বাংলা বলে পরিচিত। এই বাংলাই আধুনিক সাহিত্যিক বাংলার



হংসেশ্বরী মন্দির



হুগলি ইমামবাড়া

ভিত্তি। এই বাংলাকে মেট্রোপলিটন বা মহানগরীয় বাংলা বলা হচ্ছে কারণ হাওড়া, ২৪ পরগনা, হুগলি ও নদীয়ার মতো মেট্রোপলিটন জেলাগুলির মাতৃভাষা বাংলা। দ্বারকেশ্বর নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলের ভাষা বাঁকুড়া ও বর্ধমানের রাঢ়ি বাংলার টান পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্যের কথা, কয়েক শত বছর ইয়োরোপীয় আবাসস্থল হওয়া সত্ত্বেও এই জেলার ভাষায় বা তার ব্যাকরণে তাদের প্রভাব কণামাত্র কোথাও পড়েনি।

আকবরের সময়কার 'চন্ডী' প্রণেতা মাধবাচার্য থেকে শুরু করে ইংরেজ আমলের রামমোহন রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা এই জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫.৯.১৮৭৬-১৬.১.১৯৩৮) এই জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মেছিলেন। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রবক্তা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) জন্মস্থান হল এই জেলার কামারপুকুর গ্রাম। সারা দেশে এই জেলাতেই প্রথম (বাংলা অক্ষর সমন্বিত) মুদ্রন যন্ত্র স্থাপিত হয় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম বাংলা পুস্তকও (হ্যালহেডের *এ গ্র্যামার অব দ্য বেংগলি ল্যাংগুয়েজ*) ছাপা হয় এখানেই।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন হুগলি জেলার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ডন সোসাইটি, গড়ে বিলাতি দ্রব্য বয়কট, স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের ডাক দেন হুগলি জেলার সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বিপ্লবীদের বোমা তৈরির কেন্দ্র ছিল ফরাসি চন্দননগর।

ত্রিবেণী সঙ্গমে মকর সংক্রান্তী উপলক্ষে পুণ্য অর্জনের বিশ্বাসে বহু জায়গার স্নানার্থীদের সমাগম হয়। মেলাও বসে সেই সময়। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় জগন্নাথ মূর্তির স্নান উপলক্ষে কলকাতা এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সমবেত হন পূজার উপাচার নিয়ে মাহেশ ও বল্লভপুরে। এর ষোলো দিন পরে রথ যাত্রার উৎসব শুরু হয়। মাহেশে রথযাত্রা উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রাধারাণী' উপন্যাসে মাহেশের রথের মেলার উল্লেখ আছে। সারা বছর ধরে তীর্থযাত্রীর ভিড় লেগে থাকে তারকেশ্বরের শিব মন্দিরে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার পর চতুর্দশ দিনে শিবরাত্রী উৎসব উপলক্ষে বিরাট জনসমাগম হয়। হাজি মহম্মদ মহসিনের সিয়া ইমামবাড়ায় সাড়ম্বরে মহরম পালিত হয়।

হুগলি জেলার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির (১৮১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত) ও অনন্তদেবের মন্দির (১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত), আঁটপুরের রাধাগোবিন্দের মন্দির (১৭০৮ সালে তৈরি) ও রাজবলহাটের রাধামাধব মন্দির প্রভৃতি। ব্যান্ডেলে



ব্যান্ডেল চার্চ

রয়েছে ডোরিক স্থাপত্যে গড়া পর্তুগিজদের বানানো ১৫৯৯ সালের ব্যান্ডেল চার্চ। একসময়কার ওলন্দাজ উপনিবেশ চুঁচুড়ায় ১৬৭৮ সালে তৈরি আট-কোণা গির্জা, ১৬৯৫ সালের আর্মানি গির্জা অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। হাজি মহম্মদ মহসিনের তৈরি হুগলির ইমামবাড়া পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ।

এক নজরে হুগলি

আয়তন : ৩১৪৯ বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
জনসংখ্যা : ৪৩ লক্ষ ৫৫ হাজার (১৯৯১)
জনসংখ্যার ঘনত্ব : ১৩৮৩/প্রতি বর্গ কিলোমিটার (১৯৯১)
বনাঞ্চল (মোট জমির) : ০.১০ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
চাষযোগ্য জমি (মোট জমির) : ৭৪.৬৮ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কর্ষিত জমি : চাষযোগ্য জমির ৯৭.১৪ শতাংশ (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭-র গড়)
কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যার শতাংশ : ৪৬.৮৬ (১৯৯১)
বিদ্যুৎযুক্ত গ্রাম : ১৮৯৮টি (১৯৯৪)
বিদ্যুৎযুক্ত শহর : ২৬টি (১৯৯৪)
সাক্ষরতা : ৬৬.৭৮ শতাংশ (১৯৯১)
হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির সংখ্যা : ১৮৭ (১৯৯৪)
পাকা সড়কের দৈর্ঘ্য : ১০৯১ কিলোমিটার (১৯৯৪ পি. ডব্লু. রাস্তা)
কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য : —
মহকুমার সংখ্যা : ৪ (১৯৯৬ : চুঁচুড়া সদর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও আরামবাগ)
থানার সংখ্যা : ২১ (১৯৯৬)

তথ্যসূত্র : *আর্থিক সমীক্ষা* ১৯৯৪-৯৫, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; *Dist Statistical Handbook, Hugli, 1994. Statistical Handbook, West Bengal, 1996.*

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের নামের তালিকা

১।	ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	(১৯৪৭-৪৮)
২।	ডা. বিধানচন্দ্র রায়	(১৯৪৮-৬২)
৩।	প্রফুল্লচন্দ্র সেন	(১৯৬২-৬৭)
৪।	অজয়কুমার মুখার্জি	(যুক্তফ্রন্ট, ১৯৬৭)
৫।	ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	(পি. ডি. এ. ফ্রন্ট, ১৯৬৭-৬৮)
৬।	অজয়কুমার মুখার্জি	(যুক্তফ্রন্ট, ১৯৬৯-৭১)
৭।	অজয়কুমার মুখার্জি	(কংগ্রেস কোয়ালিশন, ১৯৭১)
৮।	সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়	(১৯৭২-৭৭)
৯।	জ্যোতি বসু	(১৯৭৭-)



পশ্চিমবঙ্গের রূপকার
ডা. বিধানচন্দ্র রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রথম মন্ত্রীসভা

১৯৪৭, ১৫ আগস্ট

১।	ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	: মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা দপ্তর
২।	সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী	: বাণিজ্য, শ্রম ও শিক্ষা।
৩।	জদবেন্দ্র নাথ পাঁজা	: অর্থ।
৪।	হেমচন্দ্র নস্কর	: কৃষি, বন ও মৎস্য।
৫।	নিকুঞ্জবিহারী মাইতি	: সেচ, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ এবং জলপথ।
৬।	কমলকৃষ্ণ রায়	: সমবায় ঋণ ও ত্রাণ।
৭।	রাধানাথ দাস	: অসামরিক সরবরাহ
৮।	কালিদাস মুখার্জী	: ভূমি এবং ভূমিরাজস্ব।
৯।	মোহিনীমোহন বর্মন	: বিচার এবং আইন।
১০।	বিমলচন্দ্র সিন্‌হা	: স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার।

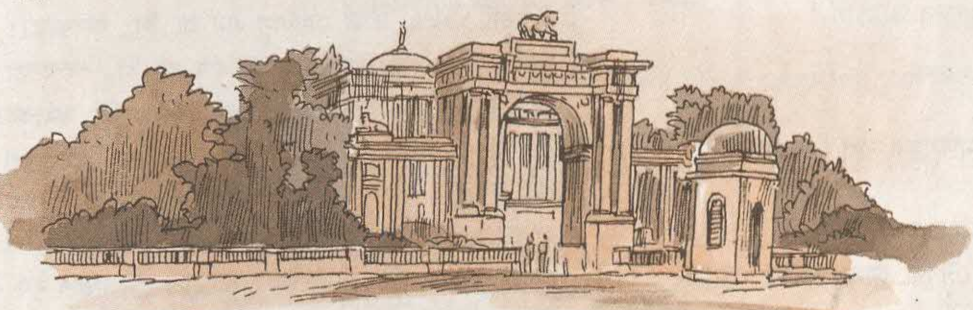
পশ্চিবঙ্গের রাজ্যপালদের নামের তালিকা

১। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (১৯.৮.৪৭-৯.১১.৪৭)
২। বি. এল. মিত্র (১০.১১.৪৭-২৩.১১.৪৭)
৩। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (২৪.১১.৪৭-২০.৬.৪৮)
৪। কৈলাশনাথ কাটজু (২১.৬.৪৮-৩১.১০.৫১)
৫। ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী (১.১১.৫১-৭.৮.৫৬)
৬। পি. বি. চক্রবর্তী (৮.৮.৫৬-২.১১.৫৬)
৭। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (৩.১১.৫৬-৬.৬.৬১)
৮। সুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী (৭.৬.৬১-৬.৮.৬১)
৯। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু (৭.৮.৬১-৩১.৫.৬৭)
১০। ধর্মবীর (১.৬.৬৭-৩১.৩.৬৯)
১১। দীপনারায়ণ সিংহ (১.৪.৬৯-১৮.৯.৬৯)
১২। শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান (১৯.৯.৬৯-২০.৮.৭১)
১৩। এ. এল. ডায়াস (২১.৮.৭১-৯.৯.৭৪)
১৪। শঙ্কর প্রসাদ মিত্র (১০.৯.৭৪-৫.১০.৭৪)
১৫। এ. এল. ডায়াস (৬.১০.৭৪-৫.১১.৭৭)
১৬। ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহ (৬.১১.৭৭-১১.৯.৮১)
১৭। ভৈরব দত্ত পান্ডে (১২.৯.৮১-৯.১০.৮৩)
১৮। অনন্ত প্রসাদ শর্মা (১০.১০.৮৩-১৫.৮.৮৪)
১৯। সতীশ চন্দ্র (১৬.৮.৮৪-৩১.৯.৮৪)
২০। উমাশঙ্কর দীক্ষিত (১.১০.৮৪-১১.৮.৮৬)
২১। সৈয়দ নুরুল হাসান (১২.৮.৮৬-১.৩.৮৯)
২২। থঙ্গভেল্লু রাজেশ্বর (২.৩.৮৯-২০.৭.৮৯)
২৩। হরিদেও যোশী (২১.৭.৮৯-১৩.৮.৮৯)
২৪। থঙ্গভেল্লু রাজেশ্বর (১৪.৯.৮৯-৬.২.৯০)
২৫। সৈয়দ নুরুল হাসান (৭.২.৯০-৪.১.৯১)



পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

২৬। কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি (৫.১.৯১-২৪.১.৯১)
২৭। সৈয়দ নুরুল হাসান (২৫.১.৯১-৩.১.৯২)
২৮। মহম্মদ শফি কুরেশি (৪.১.৯২-২৪.১.৯২)
২৯। সৈয়দ নুরুল হাসান (২৫.১.৯২-২৮.১০.৯২)
৩০। মহম্মদ শফি কুরেশি (২৯.১০.৯২-২৯.১১.৯২)
৩১। সৈয়দ নুরুল হাসান (৩০.১১.৯২-১২.৭.৯৩)
৩২। বি. সত্যনারায়ণ রেড্ডি (১৩.৭.৯৩-১৩.৮.৯৩)
৩৩। কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি (১৪.৮.৯৩-২৬.৪.৯৮)
৩৪। এ. আর. কিদওয়াই (২৭.৪.৯৮-১৭.৫.৯৯)
৩৫। শ্যামল কুমার সেন (১৮.৫.৯৯-৩.১২.৯৯)
৩৬। বীরেন শাহ্ (৪.১২.৯৯-১২.১২.৯৯)
৩৭। ভি. সি. পান্ডে (১৩.১২.৯৯-)



রাজভবন

গ্রন্থপঞ্জী

নীহাররঞ্জন রায় : **বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)**, ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : **জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য**, ১৩৫২, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার : **বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ)**, ১৩৭৭, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : **বাঙ্গালার ইতিহাস** (দুই খণ্ড), ১৩৮৯, মনোমোহন প্রকাশনী, কলকাতা।

অতুল সুর : **বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন**, ১৯৯৪, সাহিত্যলোক, কলিকাতা।

প্রভাতকুমার ঘোষ : **গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি**, ১৯৮৮, জে. এস. প্রকাশনী, কলিকাতা।

বিনয় ঘোষ : **পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি**, ১৯৫৭, প্রকাশভবন, কলিকাতা।

সচ্চিদানন্দ দত্ত রায় : **পশ্চিমবঙ্গবাসী**, ১৯৯৪, কেপি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা।

তপন মিশ্র : **বাঙলার বনজঙ্গল**, ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, কলকাতা।

পূর্ববঙ্গ রেলপথ : **বাংলায় ভ্রমণ**, (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৯৪০, কলিকাতা।

রামরঞ্জন দাস : **পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি**, ১৯৮০, ফার্মা কে এল এম, কলকাতা।

শচীন্দ্রনাথ ঘোষ : **পশ্চিমবঙ্গ** (অনুবাদ), ১৯৮০, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নতুন দিল্লি।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : **দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা**, ১৯৫৭, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গোপাল হালদার : **বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা** (দুই খণ্ড) ১৩৬১, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং লিঃ, কলিকাতা।

বিনয় ঘোষ : **মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ**, ১৯৮৪, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী : **বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি** (তিন খণ্ড), ১৯৯৫, পরিবেশক—পুস্তক বিপনি, কলকাতা।

সুভাষচন্দ্র রায় চৌধুরী : **পশ্চিমদিনাজপুর জেলার উপভাষা**, ১৩৯৫, সুনন্দা রায়চৌধুরী, পশ্চিমদিনাজপুর।

তরুণদেব ভট্টাচার্য : **বাঁকুড়া**, ১৯৮২, ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., কলকাতা।

: **পুরুলিয়া**, ১৯৮৬, ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., কলকাতা।

: **মেদিনীপুর**, ১৯৭৯, ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., কলকাতা।

বিনোদশঙ্কর দাশ (সম্পাদক) : **মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বির্বতন** (দুই খণ্ড), ১৯৮৯, সাহিত্যলোক, কলকাতা।

যুধিষ্ঠির জানা : **বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস**, ১৩৭১, কলকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা।

খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ : **কোচবিহারের ইতিহাস** (প্রথম খণ্ড), ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা।

কুমুদনাথ মল্লিক : **নদীয়া কাহিনী**, ১৯৯৮, পুস্তক বিপনী, কলকাতা।

গৌরীহর মিত্র : **বীরভূমের ইতিহাস** (দুই খণ্ড), ১৩৪৫, রতন লাইব্রেরী, বীরভূম।

সুধীরকুমার মিত্র : **হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ** (দুই খণ্ড), ১৯৭৫, মিত্রাণী প্রকাশন, কলকাতা।

সিদ্ধার্থ গুহরায় : **মালদা**, ১৩৯৮, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা।

নিখিলনাথ রায় : মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৯৭৮, পুঁথিপত্র, কলকাতা।

প্রতিভারঞ্জন মৈত্র : মুর্শিদাবাদ চর্চা, ১৩৯৫, মুর্শিদাবাদ চর্চা কেন্দ্র, বহরমপুর।

অতুল সুর : **কলকাতা : চার্ণক থেকে সি এম ডি এ পর্যন্ত এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস**, ১৯৮১, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।

বিনয় ঘোষ : **কলকাতার ইতিবৃত্ত**, ১৯৭৫, বাকসাহিত্য, কলকাতা।

Oneil Biswas : **Calcutta and Calcuttans**, 1992 Firma KLM (P) Ltd. Calcutta.

Ross Mallick : **Development Policy of a Communist Government, West Bengal since 1977**, 1993, Cambridge University Press, New Delhi.

Government of India : **Report on Industrial Potentialities in Hooghly District (West Bengal)**, 1996-97, Small Industries Service Institute, Calcutta.

Government of India : **State Industrial Profile, West Bengal.** 1996-97, Small Industries Service Institute.

The Bengal Chamber of Commerce & Industry (Calcutta) : **West Bengal, an Analytical Study**, 1971, Oxford & IBH Publishing Company, New Delhi.

S. C. Bose : **Geography of West Bengal**, 1978, National Book Trust, New Delhi.

P. C. Roy Choudhury : Temples and Legends of Bengal, 1967, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay.

Susobhan Sarkar : **Bengal Renaissance and other Essays**, 1970, People's Publishing House, New Delhi.

পত্রপত্রিকা : 'মধুপর্ণী' ও 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার বিভিন্ন জেলাসংখ্যা; 'কৌশিকী', ১৯৯৬।

: **Economic and Political Weekly**, May 5-12, 1990

কোষগ্রন্থ : বিশ্বকোষ, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা।

: ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

Gazetteers : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার।





পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য হওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের হাতছানি, পশ্চিমে রাঢ়ের শুষ্ক লালমাটির বাউল আহ্বান আর দক্ষিণের সমুদ্রসীমায় সদা গর্জমান জলরাশির বিস্তার। এই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অজস্র নদনদী, জঙ্গল, জন্তুজানোয়ার সমাহারে পশ্চিমবঙ্গের মনোহারী রূপটি ধরা রয়েছে। এর মধ্যেই মানুষ পেতেছে ঘর—তাদেরও আবার কত বিভিন্নতা, জেলা থেকে জেলান্তরে তাদের নব নব রূপ। অথচ সেই বিস্মৃতির কাল থেকে অনেক রূপান্তরের সাক্ষী এই প্রকৃতি ও মানুষ আজকের পশ্চিমবঙ্গে আর এক নতুন রূপ নিয়ে বিরাজ করছে। এই বই থেকে ফেলে আসা সেইদিনের সন্ধান পাওয়া যাবে কিছুটা, বোঝা যাবে কীভাবে বাংলা ও বাঙালি আজকের পশ্চিমবঙ্গবাসী হয়ে উঠল। কীভাবে জেলায় জেলায় বিভক্ত হয়ে পড়ল তার সার্বিক বাঙালি অস্তিত্ব।

প্রতিটি জেলার মানচিত্রসহ জেলাগুলির রূপরেখা আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে। বইয়ের প্রথমেই আছে পশ্চিমবঙ্গ-এর উপর একটি সার্বিক আলোচনার অধ্যায়—সেখানেও আছে নদী ও আঠারোটি জেলার সমন্বয়ে দুটি মানচিত্র। এ ছাড়া আছে অজস্র রঙিন ছবি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে যদি উপমহাদেশ হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তার মধ্যে একটি দেশ।

ISBN 81-86806-71-7